সমুদ্রের গান

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬২

প্রকাশক

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক

জিতেন্দ্রনাথ বসু

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া

৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ

মণীন্দ্র মিত্র

ব্লক

টাওয়ার হাফটোন কোং (১৯৫৪)

মুদ্রক

দি নিউ প্রাইমা প্রেস

বাঁধাই

স্বস্তিকা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম আড়াই টাকা

উৎসর্গ :

শ্রীমতী উমা দেবী

কল্যাণীয়াসু

এই লেখকের :

এ'জন্মের ইতিহাস—	৫৲
শ্বেত কপোত—	২॥৹
একটি রঙ্‌ করা মুখ—	২৲
সিন্ধুর টিপ—	২৲
নীলসিন্ধু (যন্ত্রস্থ)	
দেবকন্যা (যন্ত্রস্থ)	

সমুদ্রের সঙ্গ দীর্ঘদিন লাভ করবার ফলে সমুদ্র যে মনে বিপুল মোহেরই সঞ্চার ক'রেছে,—সে'কথা গ্রন্থারম্ভে নিবেদিত ক'রে রাখা ভালো। সমুদ্রকে দেখে-দেখে মনে হ'তো, হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে যেদিন প্রথম সৃষ্ট হ'লো প্রলয়-পয়োধিজল, সেইদিনই সে নিজেকে ফেলেছিল হারিয়ে ; আর সেইদিন থেকেই শুরু হ'লো খোঁজা,—নিজেকে খোঁজা ! দিনের পর দিন যুগের পর যুগ ধ'রে আজও নিজেকে খুঁজে চলেছে সমুদ্র,—তার সমস্ত উচ্ছ্বাস সমস্ত কল্লোল সমস্ত বেদনা সমস্ত আনন্দের মধ্য থেকে জাগ্‌ছে একটিমাত্র গান,—'নিজেরে হারায়ে খুঁজি !

ঠিক আমাদের মন। শাশ্বত মন। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতই বাস্তব জীবনের পারাবারে স্বপ্নের ঢেউ তুলছে! ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কতো আঘাত, কতো প্রতিঘাতের দুর্মর বেদনা, তবু তীরভূমিতে আছড়ে-প'ড়ে বাণী-সঞ্চারে তার বিরাম নেই।

স্বপ্ন আর বাস্তবের ঢেউ মনে যে তরঙ্গের সৃষ্টি ক'রেছে, এ ক্ষুদ্র উপন্যাসখানিতে সেই আবর্ত-সংকুল মনেরই কাহিনী বল্‌বার চেষ্টা করেছি ; বলা কর্তব্য,—রোমান্টিক্ মনের।

কখনো নিজের জীবনের কথাও এসে প'ড়েছে অলক্ষ্যে,—কল্পনার সংগে, মিশে গেছে বাস্তব। বাস্তবজীবনের সংগ্রামে চির 'অপরাজিত' অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের কথাও এসে প'ড়েছে অনিবার্যরূপে। এ'বিচিত্র কাহিনীতে তিনি নিজেই যে একটি 'চরিত্র' হ'য়ে গেছেন, এ'কথা বল্‌লে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হবে না।

এ'-উপন্যাসের বেশ কিছু অংশ বহুপর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। সুতরাং 'দেশ' যাঁরা নিয়মিত প'ড়ে থাকেন, তাদের কিছু কিছু যায়গা পরিচিত ঠেক্‌তে পারে। এই সুযোগে 'দেশ' সম্পাদককে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। আর ধন্যবাদ জানাই বন্ধুবর কথাশিল্পী রমাপদ চৌধুরীকে, যিনি এ' বই রচনার উৎসাহের মূলে।

বিনীত

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আঃ! কী করছ, শোনো না?

সমুদ্র ডাকছে। মনে হ'চ্ছে, সমুদ্র যেন 'এক' নয়, 'সমষ্টি'। আমি এসেছি, ওরা যেন জানতে পেরেছে আমি ওদেরই লোক, সংগে সংগে ওরা এগিয়ে আসছে আমার কাছে, সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে চায়, কে আগে বল্‌বে হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেছে, সকলের কথা একসঙ্গে মিলে প্রচণ্ড ঝড়ের মতো কানে এসে বাজ্‌ছে, শুধু কানে নয়, মর্মে।

সন্ধ্যা স্তিমিত হ'য়ে ক্রমশঃ রাত্রি নেমে এলো, নিবিড় আর ঘন কালো রাত! সমুদ্র আর আকাশ একটা কালো যবনিকায় আগাগোড়া ঢেকে গেছে, মাঝে মাঝে দূরে বন্দরের সংকেত-সূচক আলোর বিন্দুটা চম্‌কে-চমকে উঠ্‌ছে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুল্‌ছে, উঠ্‌ছে, নাম্‌ছে!···সমুদ্র আরও ব্যাকুল, আরও উত্তাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

'কই, কোথায় তুমি, দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে, শুনতে পাচ্ছ আমাদের কথা?

সাড়া দেই, বলি, 'শুনতে পাচ্ছি।'

'না, পাচ্ছ না, নিশ্চয়ই পাচ্ছ না!'

কেমন ক'রে বোঝাই, আমি ওদের শুনছি, প্রাণ দিয়েই শুনছি!

'কই তুমি, শুন্‌ছ ?'

বলতে-বলতে হাত বাড়িয়ে আসে, পারে না আমাকে ছুঁতে, কঠিন তীরভূমিতে আছ্‌ড়ে প'ড়ে ফিরে যায়, আসে, আবার ফিরে যায় !

'শুন্‌ছ গো ?'

'শুন্‌ছি ।'

'না, শুন্‌ছ না !'

কী আশঙ্কা ! বুঝি শুনল না, এত কথা বলে যাচ্ছে, ওকে বোধ হয় কেউ-ই শুনল না !

'কাছে আছ ?'

'আছি ।'

এতক্ষণে চাঁদ উঠ্‌ল আকাশে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঝিক্‌মিক্‌ ক'রে এতক্ষণে হেসে উঠ্‌ল, অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আমাকে, পাচ্ছে আভাষ,—আমি আছি ! মুহূর্তের মধ্যে উল্লাসে হিল্লোলিত হ'য়ে উঠ্‌ল ।

'ঐ ত তুমি, ঐ ত তুমি!'

হাত্‌তালি দিয়ে উঠ্‌ছে, নেচে উঠ্‌ছে, ফুলে উঠ্‌ছে !···

'আসবে ? দুলবে আমার ঢেউয়ের দোলায় ?'

'দুল্‌ব ।'

'ঠিক ?'

'ঠিক-ঠিক-ঠিক ।'

বলল,—'সারারাত অম্‌নি ব'সে থাকবে কাছে ?'

'সারারাত ! ঘুমবো না ?'

'না-ই বা ঘুমুলে ?'

চুপচাপ ব'সে রইলাম। দেখে-দেখে চোখ যেন ফেরে না ! জ্যোৎস্না-ঠিক্‌রে-পড়া-আব্‌ছা-আঁধারে কে যেন শুভ্র অক্ষর পংক্তি পরপর অবিরাম লিখে চলেছে ! ঐ আদিম উদ্দাম উন্মুক্ত মনের কাছে আমারও মনটি গিয়ে চুপিচুপি দাঁড়ায়, তার সমস্ত নির্মোক খুলে ফেলে ! এই যে একেবারে-কাছে-গিয়ে-দাঁড়ানো,-এর উল্লাস আমার জীবনে অনাস্বাদিতপূর্ব !···যারা আমার প্রিয়জন, তাদের সংগে যেন আদৌ বিচ্ছেদ ঘটে নি ! তাদের কথা, তাদের ছবি যেন ঐ সমুদ্রই আমার চেতনার তটে পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল ক'রেই এঁকে দিয়ে যাচ্ছে ! তাই, স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলি ভারী চমৎকার ব্যঞ্জনায় আবার লেখা হচ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি ! যেখানে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল, তা-ও পরিচ্ছন্ন হ'য়ে জ্যোতি বিকীরণ কর্‌ছে।

কেন জানি না, যার কথা সবার থেকে আগে মনে পড়্‌ছে,— সে,—কণা। পাশের বাড়ীর মেয়ে। আমার বয়ঃসন্ধিকালের স্বপ্নচারিণী ! অবাক হ'য়ে ওকে দেখেছি,—অস্ফুট কুঁড়ির সুপ্তি থেকে ঝলোমল শতদলের অকস্মাৎ পাপ্‌ড়ি-মেলে-জেগে-ওঠা !

পাশাপাশি দেখেছি ওর সেই অনুপমদাকেও। কত কী-ই না মনে হ'তো ওদের দেখে !

কুয়াশা-ঘেরা শীতের ভোরে ছাদে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক্‌ত কণা। কুয়াশায়-কুয়াশায় অস্পষ্ট চারিদিক,—গায়ের

গোলাপী শালটা ভালো ক'রে জড়িয়ে নিতো। খোঁপা-ভাঙা শিথিল চুলগুলি এলিয়ে প'ড়েছে, নিবিড় মমতায় কাঁধের হু'পাশ দিয়ে চুলের হুটি গোছা বুকের উপর টেনে আনত। ঘন, দীর্ঘ আর কুঞ্চিত চুল।

ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হ'য়ে আসছে সামনের বাড়ী আর পথ,— কণা চোখ মেলল পরিপূর্ণ ক'রে। বড়ো-বড়ো, টানা-টানা, ভাসা-ভাসা চোখ হু'টি।

তখন, সেই মুহূর্তে, সেই কুয়াশা-মিলিয়ে-আসা ছাদের ওপরে, ওকে কেমন দেখাচ্ছিল,—ও' কী তা' জানে ?

এলানো ঘন চুলের বন্যা, নমনীয় সুডৌল হাত হু'টি আল্সের ওপরে ভর দেওয়া, চোখের তটে সূক্ষ্ম কাজল রেখা তখনো ছুঁয়ে আছে,—কালকের পরা লাল-লাল শাড়ীটা তখনো অন্তরঙ্গ ভঙ্গিমায় মিশে আছে সদ্য-বিকশিত তনুদেহের সঙ্গে।

শীগ্‌গিরই ওর নাকি বিয়ে হবে। হয়ত কুয়াশায়-কুয়াশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ওর বিয়ের কথাই ভাবছিল ও'। হয়ত ভাবছিল,— কেমন না জানি সে হবে!···উজ্জ্বল হয়ত হবে তার স্বাস্থ্য, হয়ত ও'বাড়ীর রমাদির বরের মতো সুন্দর হাসবে সে। হয়ত প্রচুর ধনী, হয়ত বিদ্বান। আর···আর···কথাটা ভাবতে গিয়েই হয়ত হাসি ফুটে ওঠে কণার পাৎলা হুটি আরক্ত ঠোঁটের তটরেখায়,— যদি সে রমাদির বরের মতন সেইরকম হুষ্টু হয়!···ওরা মেয়েরা সেই যে রবিবারের হুপুরে ছাদে বসে হাসাহাসি করছিল নিজেদের মধ্যে,—সেই রমাদির কথা নিয়ে! হুপুরে ঘুমিয়ে আছে

রমাদি, ওর বর না চুপিচুপি ঘরে ঢুকে একেবারে রমাদির কাছে এসে, সেই ঘুমন্ত মুখের ওপর···। ছি, ছি! কণার মুখচোখ বুঝি লাল হ'য়ে ওঠে,—সত্যি, ছেলেরা ভয়ানক দুষ্টু!···

আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে ছাদটা। কণা মুখ ফেরালো। আশ্চর্য, ছাদটার একেবারে প্রান্তে ঐ কোণটাতে কে যেন দাঁড়িয়ে। শাদা একটা চাদর গায়ে। এতক্ষণ একেবারেই চোখে পড়েনি। হয়ত কুয়াশার জন্যই। অদ্ভুত! কে জাগল এত ভোরে এই বাড়ীতে? তবে কী······

নিশ্চয়ই অনুপম···অনুপমদা। না হয়ত এত পাগলামীই বা আর কার!

নীচের তলাকার ভাড়াটেদের বড়ো ছেলে অনুপম। কলেজের ছাত্র।

ওর কথা মনে হ'লে কণার হাসি পায়। কী লাজুক! দিনরাত ওর সেই ছোট্ট ঘরটায় ব'সে কী যে মাথামুণ্ডু পড়াশুনা করে, কে জানে!

কণা তখন ছোট্টটি। ফ্রক্ প'রে স্কুলে যায়,—তখন থেকেই পরিচয়। অথচ, আজকাল ওর সঙ্গেই ভালো ক'রে কথা বলতে লজ্জা পায় অনুপম।

কী যেন আপন মনে ভাবতে ভাবতে এতক্ষণে অনুপমদা সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওকে বোধ হয় এখনো দেখতে পায় নি।

এগিয়ে আসছে কাছে, কিন্তু কণার বুকটা এমন হঠাৎ

টিপ্ টিপ্ ক'রে উঠ্ছে কেন! যেন মৃদু একটা শিরশির ব'য়ে যাচ্ছে সারা শরীরে! দূর, ওকে আবার লজ্জা! চুলের একটা গোছা হাতে জড়িয়ে নিয়ে, মাথাটা একটু হেলিয়ে হাসি-হাসি মুখে ডেকে উঠ্ল কণা,—'অনুপমদা?'

ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়্ল অনুপম। আর ওর ঐ নির্বাক জড়োসড়ো ভঙ্গী দেখে খিল্খিল্ করে হেসে উঠ্ল কণা, —এ অবস্থা দেখলে কার না হাসি পায় বলো!

'কী ব্যাপার অনুপমদা, এত ভোরে উঠেই একেবারে ছাদে!'

কেমন যেন অপ্রস্তুতের ভঙ্গী, অনুপম বলে,—'মানে···হঠাৎ ···ইচ্ছা হ'ল ···'

'হঠাৎ!'—আবার হেসে উঠ্ল কণা।

অনুপম ধীরে ধীরে মুখটা তুলে তাকালো ওর দিকে। ভারী কৌতুককর লাগল ওর ঐ সঙ্কুচিত দৃষ্টি। ওর কাছে স'রে যায়, হাসি মুখে বলে,—'অনুপমদা?'

'কী?'

'চুপ ক'রে আছ যে?'

'এই দেখছি আর কী!'

'দেখছ? কী দেখছ?'

'এই···মানে···কী সুন্দর এই ভোরবেলাটা!'

হাসি পায় কণার। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যই যদি দেখবে, ত, অমন ক'রে ওর দিকে তাকাচ্ছে কেন তবে? বললেই ত পারে,—'দেখছি তোমাকে, তুমি কী সুন্দর!'···

সত্যি, কণা ভাবে,—সদ্য-ঘুম-থেকে-উঠে-আসা ওকে এখন না জানি কেমন দেখাচ্ছে!

অনুপম সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

'বারে, চললে কোথায়?'

'ঘরে।'

'দূর ছাই, তোমার খালি ঘর আর ঘর!'

অনুপম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব'লে ওঠে,—'এসো না? আমার ঘরে একটু আসবে?'

চকিতে কণা ওর একেবারে কাছে ঘন হ'য়ে এলো, তারপরে অকারণে কেমন-যেন চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বলল,—'চলো।'

কিন্তু পরক্ষণেই থমকে দাঁড়ালো, সিঁড়িটার দিকে একবার শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে ব'লে উঠ্‌ল,—'না-না, এখন থাক্‌, অন্য একদিন···অন্য একদিন···কেমন?'

তারপরে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল কণা। কিন্তু অনুপমদার ঘরে সত্যিই আর ওর যাওয়া হয়নি,—কেমন যেন লজ্জা করত ওর!

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, কণার অন্তরঙ্গ কথাগুলি, কণার হৃদয়ের ঢেউগুলির অনুরণন,—আমি শুনলাম কী ক'রে, জানলাম কী ক'রে?

উত্তর অতি সহজ,—কিছু দেখেছি, কিছু জেনেছি নিজের অনুভূতি দিয়ে,—হয়ত কিছু কল্পনাও মিশে গেছে। সে, আমার

প্রথম যৌবন-উন্মেষের ভালো-লাগা। বাস্তবের সংগে মিলে-যাওয়া স্বপ্ন!

নিঃসঙ্গ দুপুর। কণা হয়ত শুয়ে আছে ওর ঘরে। ওর যে বর হবে, সে যদি এসে ওর সামনে দাঁড়ায়! সেই সুন্দর বলিষ্ঠ মূর্তি, ধনী আর বিদ্বান্, হয়ত বা বিলাত-ফেরৎ,—যদি সে এখন মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, ডাকে, 'কণা?'

দুরন্ত লজ্জায় বিছানায় একেবারে উপুড় হ'য়ে পড়বে কণা, —দুর, যদি কেউ দেখে ফেলে, তাহ'লে!

ঘড়ীর কাঁটাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় অপরাহ্নের দিকে। হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে ওর মনে। অনুপমদা কী কণাকে ভালবাসে?

নীচের মাসিমা অর্থাৎ অনুপমদার মা সেদিন বল্‌ছিলেন, ওঁদের সাংসারিক অবস্থা খারাপ, ছেলেকে 'আই-এ'-র পর আর পড়াতে পারবেন না,—চাকরীর চেষ্টাই দেখবেন। কিন্তু চাকরীই বা আজকালকার দিনে হঠাৎ মিল্‌ছে কোথায়!' সত্যি অনুপমদারা গরীব, বড়ো মায়া হয় ওর জন্য। বেচারী অনুপমদা!

কেটে গেল দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস। শীত গেল, গ্রীষ্মও গেল ব'লে, আস্‌ছে বর্ষা। আজকাল আর কণা ছাদে আসে না,—যে রোদ্দুর আর গরম ছাদটায়!...ছুটীর দিন দুপুরে আমাদের ছাদে উঠে চিলেকোঠার ছায়াটিতে গিয়ে কতোবার ব'সেছি—কিন্তু দেখিনি কণাকে।

অনুপমদারা শীত ঝ'রে যাবার সংগে-সংগেই বাড়ীবদল ক'রেছে,—এই রাস্তাটারই আরেক প্রান্ত,—ছোট্ট একটা বাড়ী। কণার মা প্রায়ই দুপুরে নাকি ওদের বাড়ী যান, অনুপমদার মার সংগে খুব ভাব তাঁর,—কণাকেও মাঝে মাঝে যেতে বলেন তিনি,—কিন্তু কেন যেন ওর কোথাও যেতে আজকাল মোটেই ইচ্ছা করে না,—কেমন একটা অহেতুক লজ্জা ওকে যেন ঘিরে ফেলছে,—কেমন-একটা আবেশ আর আলস্য!

মাঝে মাঝে ওর মনে পড়ে বই কী অনুপমদাকে। কিছুদিন আগে ওর মার কাছ থেকে খবর পেলো কণা,—অনুপমদা আই-এ পাশ ক'রেছে, কিন্তু আর পড়বে না,—চাকরীর চেষ্টায় হয়রাণ হ'য়ে ঘোরাঘুরি করছে বেচারী! সত্যি, কণা একবার ওদের বাড়ী গেলে পারত! অবশ্য, ছেলেটাও পারত বুদ্ধি ক'রে ওদের বাড়ী আসতে! তা' আস্‌বেনা, যে লাজুক,— আবার তা-ই নয়, একটু অভিমানীও বটে। কেমন আছে সে,— কে জানে? কণার কিন্তু এক-একসময় বড়ো কৌতূহল হয়! একবার ভাবে মাকে ডেকে সব জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু পরক্ষণেই সংকোচ আসে, মা আবার যদি কিছু ভাবেন।···বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে কণার, একেবারে এই আষাঢ়ে। নিজেই এসেছিল ওর বর ওকে দেখতে, নিজেই সে পছন্দ ক'রে গেছে। বিদ্বান ও বিলাত-ফেরৎ সে,—স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর।

এক একসময় ওর খুব ভালো লাগে সেই সব কথা ভাবতে। মোটর ছুটেছে, হু-হু ক'রে আসছে হাওয়া। উঃ! এতো জোরে

ছুটছে গাড়ীটা! চোখ উঠ্ছে জ্বালা ক'রে। হাওয়ায়-ওড়া আঁচলটা চোখে চেপে ধ'রে কণা পাশের দিকে মুখ ফেরায়। আস্তে আস্তে বলে,—'এই, তুমি করছ কী? এতো জোরে বুঝি গাড়ী চালায়?'

মোটর যে চালাচ্ছিল, সে এবার কণার দিকে মুখ ফেরালো। অবিকল ওর সেই দেখতে-আসা বরের সুন্দর মুখখানা। ওর দিকে তাকিয়ে তেমনি মিটিমিটি হাসে, কিছু বলে না। কণা স'রে আসে লোকটীর খুব কাছে, বলে, 'বড়ো দুষ্টু তুমি, জোরে গাড়ী চালাচ্ছ, ভয় করে না আমার?'

থেমে যায় গাড়ী পরক্ষণেই। লোকটী সেইরকম দুষ্টু হাসি হাসতে হাসতেই ওর দিকে ঝুঁকে একেবারে ওর মুখের ওপর···। ধ্যেৎ, কণা এক ঝট্কায় স'রে যায়, কেউ যদি এখন দেখে ফেলে, তাহ'লে? অথচ এই ভদ্রলোক ঠিক তেমনি মুখ টিপেটিপে হাসছে। কণাও হেসে অন্যদিকে মুখ ফেরালো! ওমা,—এ-কে? এযে অনুপমদা! মুখখানা ম্লান, চোখ দুটি ছলোছলো!

'অনুপমদা? কী ব্যাপার?'—কণা মোটর থেকে ফুট্পাথে নেমে দাঁড়ায়, পিছন-পিছন সেই ওর বর। তার দিকে ফিরে কণা অনুপমদাকে দেখিয়ে বলে,—'ওগো, একে তুমি চেনো? আমাদের অনুপমদা!'

'ও'।

কণা এবার অনুপমদার কাছে স'রে আসে, বলে, 'কেমন আছো অনুপমদা?'

কোনো উত্তর সে দেয় না, ম্লান একটু হাসে শুধু। বেচারী অনুপমদা! কথা আবার ওর সেই বরের দিকে তাকায়, বলে, 'ওগো, শুনছ? তোমার ত অনেক বড়ো-বড়ো লোকের সংগে আলাপ, দাও না অনুপমদাকে একটা চাকরী ঠিক ক'রে, বড়ো গরীব অনুপমদা।'

ভদ্রলোক বলেন, 'বেশ ত, আপনি একবার আমার সংগে দেখা করবেন। আমি চেষ্টা করব!'

কৃতজ্ঞতায় অনুপমের চোখ যেন আরো ছলছলিয়ে ওঠে।

আবার ছোটে মোটর। আবার তেমনি আসে বাতাস হু-হু ক'রে, কণার ঘোমটাটা খালি খুলে খুলে যায়। সে আবার বলে,—'এই আস্তে।'

দুষ্টু হাসি হেসে ভদ্রলোক ওর হাত চেপে ধরেন। কণা একবার ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ছাড়াবে সাধ্য কার? যে লোহার মতো শক্ত হাত! কণার এবার সত্যিই হাতটা ব্যথা ক'রে ওঠে।

ধড়্মড় ক'রে জেগে ওঠে কণা। ঈস্, বেলা যে এদিকে গড়িয়ে গেল,—দেয়ালের বড়ো ঘড়ীর কাঁটাটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আচ্ছা ঘুম সে দিয়েছে যা'হোক। আর হাতটা খাটের বাজুর সংগে ধাক্কা লেগে যা' ভয়ানক আঘাত দিয়েছে!···মা এসে ঘরে ঢোকেন। কণা ততক্ষণে খাট ছেড়ে মেঝের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে।

'কী রে, ঘুমোচ্ছিলি নাকি?'—

'হ্যাঁ মা, হঠাৎ আজ ঘুমিয়ে প'ড়েছি।'

মা ততক্ষণে সামনের চেয়ারটায় ব'সে প'ড়েছেন। 'বাব্বাঃ! ওদের বাড়ীটা যা দূর!'

'কাদের বাড়ী?'

'অনুপমদের,'—মা বলেন,—হেঁটে আসতে গিয়ে পা-টা ধ'রে গেছে একেবারে।'

'আহা, ভারী ত দূর, এখান থেকে ঐটুকু।'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমাদের মতো বুড়ী হ'য়ে নে, তখন ঐটুকু পথই হেঁটে দেখিস।'

কণা একটু হাসে, বলে, 'আজ যে আবার হঠাৎ ওদের বাড়ী গেলে?'

'হঠাৎ কী রে? অনুপমরা কী আমাদের পর?'

তারপরে একটু থেমে আবার বলেন, 'ভালো কথা কণা, শুনেছিস?'

'কী, মা?'

'সামনের শুক্রবার অনুপমের যে বিয়ে।'

কণা যেন আকাশ থেকে পড়ে,—'বিয়ে!'

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। কিন্তু খুব ভালো হ'লো। সোনার চাঁদ ছেলে অনুপম, কর্মী ছেলে। ভালো চাকরী পেয়েছে। আর বউটিও হবে নাকি খুব সুন্দরী, ফর্সা টুকটুকে রঙ্!'......

ওর মনের কুয়াশা কখন কেটে গেছে! অতি মাত্রায় স্পষ্ট

মনে হ'তো ছাদটা,—প্রখর রৌদ্রে যেন ঝল্‌সে-ওঠা। ও' এসে এক-একসময় দাঁড়াতো আল্‌সের ওপর হাত রেখে,—নিষ্প্রাণ এক প্রস্তরের মূর্তি। আমার ছোট বোনটিকে যে চশমা-চোখে শিক্ষয়িত্রীটি প্রতি সন্ধ্যায় পড়াতে আসেন,—তাঁরই মতো রুক্ষ আর গম্ভীর মনে হ'তো তখন কণিকাকে।

ক্রমে একদিন আমার মায়ের কাছে শুনলাম, ও'নাকি নিজেই ভেঙে দিয়েছে ওর বিয়ে। বিয়ে ও'এখন করবে না, —পড়্‌বে। অভিভাবক্‌দের কঠিন তিরস্কারও ওকে ওর সঙ্কল্প থেকে চ্যুত করতে পারে নি।

দিনের পর দিন দেখতে লাগলাম ছাদের ওপর এক খোদাই-করা নিথর মূর্তিকে। দেখতে দেখতে মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি এলো,—মনে হ'লো,—দিন যাবে, মাস যাবে, বছর যাবে,—ওর বয়স হবে, ওর চোখে উঠ্‌বে চশমা,—আমার বোনকে যিনি পড়াতে আসেন, সেই শ্রান্ত মহিলাটির মতো ও'তখন হয়ত শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে সহরের এ'প্রান্ত থেকে ও'প্রান্ত। ওদের বাড়ীর ছাদের যেখানটায় ও'এসে রোজ দাঁড়ায়, ওখানে ধরবে গভীর ফাটল, অশ্বত্থ-শিশু ডালপালা মেলে জেগে উঠ্‌বে!

তখন কী ওর কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়্‌বে অনুপমদাকে? পড়েই যদি, কী ওর মনে হবে অনুপমদার সম্বন্ধে!…কণাকে কর্মব্যস্ত শিক্ষয়িত্রীর বেশে ভাবতে কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত লাগছে! এ'যেন এক খেলা,—যাকে ভালো লাগে, তাকে মনের রঙে

রাঙিয়ে নানান্ রূপে গ'ড়ে তোলা! ছোট মেয়েরা যেমন নিঃঝুম মধ্যাহ্নে চিলেকোঠার মধ্যে ব'সে আপন মনে পুতুল নিয়ে খেলা করে,—পোষাক খোলে আর পরায়,—আমিও তেমনি মনের মণিকোঠায় ওকে বসিয়ে নানান্ সাজে সাজিয়ে অপরূপ এক খেলার নেশায় ডুবে যাচ্ছি!

যদি না-ই ঘট্‌ত ঐ ঘটনা! যদি অনুপমদা চ'লে যেতো ইংলণ্ড কিম্বা আমেরিকায়,—যদি কণা অম্‌নি ছাদে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করত অনুপমদার ?

ধরো, দীর্ঘ আট বছর কেটে গেল প্রতীক্ষায়। হয়ত সব একদিন ভুলেই গেল কণিকা। নানান্ কাজের মধ্যে জড়িয়ে ফলেছে নিজেকে,—সময় নেই। সময় নেই একান্ত ক'রে নিজের কথা ভাববার!

ছাত্রীর পড়ার ঘরে যেন চুপচাপ ব'সে আছে কণিকা। ছাত্রী বিজলীর বইগুলো টেবিলে ছড়ানো র'য়েছে, একখানা বই খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই যেন তুলে নিলো হাতে। চিরপরিচিত ভূগোলখানা,—স্কুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি প্রাইভেট্ টুইশানীতে এসেও বইখানা ওকে নিষ্কৃতি দেয় না,—শিক্ষয়িত্রী-জীবনে প্রবেশ ক'রে সারা পৃথিবীর খবরই ওকে কণ্ঠস্থ রাখতে হয়।...পাতা ওল্‌টাতে লাগ্‌ল। বোষ্টন,—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মস্ত বড়ো বন্দর বোষ্টন,—কলকাতা থেকেই বেশ কল্পনা ক'রে নিতে পারা যায় সমস্ত শহরটাকে। বোষ্টন—বোষ্টন। সত্যি কথা, অনুপমদা না আছে এইখানেই ? কতো

বছর হ'য়ে গেল বোষ্টন চ'লে গেছে অনুপম,—আজও তার কোনো খবর নেই,—নিখোঁজ। বোধ হয় বছর দশেক হ'য়ে গেল,—না, না,—অত নয়,—আটবছর হবে। ওর হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে ব'লেছিল অনুপম,—'প্রতীক্ষা ক'রো কণা, আমি আবার ফিরে আসব তোমার কাছে।'

ম্লান একটা হাসি ফুটে ওঠে,—আর কতদিন? সময় কী হয় নি? হাতের বইখানা ওল্‌টাতে লাগ্‌ল।...হঠাৎ বইটা থেকে কী-একটা খ'সে পড়ল। কী এটা? ভাঁজ-করা একখানা কাগজ,—মনে হ'লো যেন কার চিঠি। কাগজখানা পুনর্বার ঠিক ক'রেই রেখে দিচ্ছিল,—হঠাৎ কী মনে ক'রে খুলে ফেলল সেখানা। হাতের লেখা তার ছাত্রী বিজলীর। কিন্তু চিঠি বোধ হয় নয়,—মনে হচ্ছে, যেন ডায়রীর একটা পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠার ওপরে নম্বর রয়েছে,—তিন। ভয়ানক কৌতূহল হ'লো,—ছাত্রী তখনো গা ধুয়ে ওপর থেকে নীচে নামে নি,—অবসর বুঝে পৃষ্ঠাটা কণা পড়্‌তেই শুরু কর্‌ল,—'ওর চিঠি পেলাম। লিখেছে, আজ সন্ধ্যায় নতুন লেক্‌টার দক্ষিণে রেল-লাইনের কাছে যেখানে কতগুলি তাল আর নারিকেল গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে,—সেখানে সে অপেক্ষা কর্‌বে,—আমার সংগে নাকি তার দেখা হওয়া চাই-ই,—কী যেন একটা দরকারী কথা আছে। মনে-মনে হাসি, দরকারী কথাটা যে কী, তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। যাই হোক্‌, ওর কথাটা আজ রাখতে হবে। সন্ধ্যায় আজ আর পড়্‌বো না, মাথা-ধরার ছুতো ক'রে ছুটি নেবো।'...

আর পড়ল না কণিকা, কাগজটা ভাঁজ ক'রে বইখানার ভিতরে রেখে দিলো। লুকিয়ে লুকিয়ে ঐটুকু মেয়ের তাহ'লে এই সব হ'চ্ছে? অবশ্য এ জন্য মেয়েটাকে কী কঠিন ভাবে তিরস্কার করা চল্‌বে? এখন ত ও তবু আঠারো,—কণিকার ওর নিজের সেই ষোলবছর বয়সটাকে মনে পড়্‌ল। সেই কুয়াশার মধ্যে ছাদে দিয়ে দাঁড়ানো। তখন সে একেবারেই ছেলেমানুষ, আর অনুপমদা তখন বোধ হয় কুড়িরও বেশী নয়।

কিন্তু বিজলী মেয়েটা কেমন যেন বোকা। একটা খোলা—আল্‌গা কাগজে কি কেউ ডায়রী লেখে? আর লিখ্‌লেও সেটা কি কেউ এমনিভাবে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখে?—আর বিশেষতঃ এই সব লেখা! কণিকা না হয় নেহাৎ করুণা ক'রেই এটা উপেক্ষা ক'রে গেল,—কিন্তু অভিভাবকদের কারুর হাতে যদি এ সব পড়্‌ত? তখন কী দশা হ'তো বিজলীর?··· ওকে একবার সাবধান ক'রে দেবে নাকি? পাগল, তা-ও কি হয়,—শিক্ষিকা হ'য়ে ছাত্রীকে সে এ'বিষয়ে কী-ই বা বলতে পারে? শুধু তা-ই নয়, সে যে এ'বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছে, এটাও বিজলীকে বিন্দুমাত্র জানতে দেওয়া তার উচিত নয়।

এতক্ষণে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ বেজে উঠছে বিজলীর, কণিকার হাসি পায়, মেয়েটা এসে ওকে যে কী বলবে, তা ওর বেশ জানা। মেয়েটার মুখখানা নিশ্চয়ই একটু শুক্‌নো-শুক্‌নো দেখাবে, মৃদু পায়ে সে ঘরে ঢুকবে, তারপরে একটু ইতস্ততঃ

ক'রে বলবে,—'কণাদি, আজ একটু ছুটী দিন না, বড্ড মাথা ধ'রেছে।'

কণিকা উত্তরে কী বলবে? বলবে,—'না, পরীক্ষা তোমার সামনে।'—এই বলবে? না, না,—অতটা নির্মম সে কিছুতেই হ'তে পারবে না।

ঘরে এলো বিজলী। কণিকার অনুমান মিথ্যা নয়,—মেয়ের মুখখানা দস্তুরমতো শুক্‌নো দেখাচ্ছে। টেবিলের ধারে এসে বস্‌ল। এইবার······। প্রথমে একটু ইতস্ততঃ কর্‌বে, আর সেটা স্বাভাবিকও, তারপরে ধীরে কুণ্ঠিত কণ্ঠে চাইবে ছুটী।

কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই বলছে না মেয়েটা, দিব্যি বই খুলে ব'সেছে। ওদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো,—ছুটী যখন নিতে হবেই, তখন এত ইতস্ততঃ ভাব কেন বাপু?

কণিকা ছদ্ম গাম্ভীর্যেই বলে,—'খোলো বই, পড়া দেখাও।'

ভূগোল। আবার মনে প'ড়ে যায় আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের কথা,—বোষ্টন-নগরীর কথা।

'আচ্ছা, বলো ত বিজু, হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি কোথায়?'

'হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নাম শোনো নি?'

'না ত!'

'আশ্চর্য! খোলা বই, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। পড়া শুরু হ'লো বিজলীর। ওর মনটা যে লেকে যাবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে

সেটা—অথচ মুখ ফুটে চাইতে পার্‌ছে না ছুটী। অবশ্য ওর সংকোচটাও বুঝ্‌তে পার্‌ছে কণা, কিন্তু তা' হ'লেও ছুটী চাইলে কিছু মনে করতো না সে। সত্যি, মেয়েটার অবস্থা দেখে বড্ড মায়াই হয়।

অবশেষে কণিকাই উঠে দাঁড়ালো। যে ভীরু মেয়ে, নিজে ত আর ছুটী নিতে পার্‌ল না, অতএব ওকেই নিতে হ'লো ছলনার আশ্রয়। বলল,—'দেখ বিজু, মাথাটা ধ'রেছে, পড়াতে পার্‌ছি না,—আজ তোমাকে ছুটী দিলাম, বুঝ্‌লে ?'

অম্‌নি ঠিক প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছে মেয়েটার মুখ। কণিকা বলল,—'আর শোনো, পড়্‌তে এখন ভালো না লাগলে বরং লেকে একটু গিয়ে বেড়িয়ে এসো।' ব'লেই মনে মনে বেশ একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌ল কণিকা। মেয়েটা আবার যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে সে ও'সব বিষয়ে বিন্দুমাত্রও জানতে পেরেছে।

তাড়াতাড়ি কণিকা বেরিয়ে এলো বাইরে। দীর্ঘ পথটার ওপর সন্ধ্যা নাম্‌ছে—অপূর্ব স্নিগ্ধ সন্ধ্যা! ঠিক এই মুহূর্তে যদি নিরালা কোনো যায়গায় গিয়ে সে বস্‌তে পার্‌ত! পরিপূর্ণ বিশ্রাম আর শান্তি। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্যে।

পথ চলতে লাগ্‌ল কণিকা। সামনেই মোড়। মোড়ের ডান দিকে ঘুর্‌লেই নতুন লেক্। যাবে না কি সে একবার লেকে? এই ত সেই রেল্‌-লাইনের ধারের নারিকেলগাছগুলো।

ওঃ! কতদিন যে সে আসেনি এখানে!···ভালো কথা, বিজলীও না আসবে এখন? কে একটি ছেলে ওর জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবে না ওখানে? নারীসুলভ অদম্য কৌতূহলবশতই নারিকেল-কুঞ্জের দিকে পা বাড়ালো কণিকা।

কিন্তু অপেক্ষমান ছেলেটীকে ভয়ানক চেনা-চেনা ঠেক্‌তে লাগল একটু দূর থেকে! কে ছেলেটী?···আরও এগিয়ে গেল কণিকা। আরে, এ'যে সৌম্যেন, তাদের স্কুলের টিচার মিসেস্ সোমের ছেলে সৌম্যেন।

'তুমি এখানে, সৌম্যেন?'

ঠিকই ধ'রেছে কণিকা, নইলে ওর ঐ সামান্য প্রশ্নে ছেলেটা অমন অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠ্‌ল কেন! তা' হ'লে, সৌম্যেনই হ'লো বিজলীর······। একটু ইতস্ততঃ করবার পর উত্তর দিলো সৌম্যেন,—'এই ··মানে···মানে···এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা···এই আর কী!' হাসি পেলো কণার,—অনুপমদা, একেবারে অনুপমদার মতো সেই সলজ্জ ভঙ্গীতে 'মানে···মানে' ব'লে-ওঠা! এ'বয়সের সব ছেলেই কী সমান?

এগিয়ে গেল কণিকা। সাম্‌নে একটা খালি বেঞ্চ। এখানে একটু বসবে নাকি সে? মন্দ হয় না, এতখানি হেঁটে পা-ও ধরে গেছে। কিন্তু ওরা আবার দেখতে পাবে না ত? বিজলী এসে ওকে দেখলে লজ্জাই পাবে হয়ত। তা'হোক, বেঞ্চিতে ব'সে পড়্‌ল কণিকা, বিজলী এলে ওদিকে সে তাকাবে না, মুখ ফিরিয়েই থাক্‌বে।

একটু পরেই দেখা গেল বিজলীকে। অবশ্য একা আসে নি, ছোট্ট ছ'বছরের ভাইটা সংগে। নারিকেল-কুঞ্জের কাছে এসে থামল বিজলী,—ঐ যে পায়ের জুতোটা ঠিক ক'রে নিচ্ছে! অবশ্য ওটা হ'লো ভূমিকা। সৌম্যেনও চেয়ে আছে বিজলীর দিকে।

কিন্তু মেয়েটা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ওকে দেখতেই পেয়েছে। সৌম্যেনকে ছাড়িয়ে ওর দিকে এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি, বলল,—'কী মজা! কণাদি, আপনিও এখানে!'

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে কণিকা, বলল,—'হ্যাঁ, এই এলাম একটু বেড়াতে-বেড়াতে। কিন্তু...

'কী, কণাদি?'

বেশ বুঝ্‌তে পারে কণা ওদের সংকোচ আর লজ্জার ভাব।

'এসো বিজু, আলাপ করিয়ে দেই।'

'কার সংগে!'

'এসোই না।'

কী আর করা যায়, নিজের হাতে যখন ওরা এমন সন্ধ্যাটাকে মাটি ক'রে দিতে যাচ্ছে, তখন ওকেই দিতে হবে ওদের ভয় ভাঙিয়ে। এগিয়ে গেল নারিকেল-কুঞ্জের দিকে।

'সৌম্যেন শোনো?'

ওর আহ্বানে কাছে এসে দাঁড়ালো সৌম্যেন।

'আলাপ করিয়ে দেই। এ'হচ্ছে শ্রীমান্ সৌম্যেন সোম, আর এ'আমার ছাত্রী বিজলী ব্যানার্জী।'

ছেলেটা কিন্তু অনুপমদার মতই লাজুক,—চেষ্টা ক'রেও যেন বলতে পারছেনা,—'ওকে আমি চিনি।'

কিন্তু ঐ যে ওদের চোখেমুখে একটা সলজ্জ আভা ফুটে উঠ্‌ছে,—ওটা কণিকার চোখ এড়িয়ে কোথায় লুকাবে ওরা ?

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

কিন্তু সৌজন্য-বিনিময়ের পরই ওরা দুজন চুপচাপ হ'য়ে গেল। কণিকা বলল,—'আসবে না কি সৌম্যেন, আমাদের সংগে ?'

'আজ নয়, আজ আমাকে ক্ষমা করুন।'

না আদৌ সাহসী নয় সৌম্যেন। কণিকা কী তা'ব'লে বেশীক্ষণ থাকত ওদের সংগে ?

এখ্‌খুনি চ'লে যেতো। তারপরে ওরা দু'জনে লেকের ধারে পাশাপাশি ব'সে থাক্ যতক্ষণ ইচ্ছা,—অ-রসিকের মতো কেউই আর আসবে না বাধা দিতে।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর কী ভেবে কণিকা বিজলীকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—'সৌম্যেনকে তুমি আগে থাকতেই চিনতে, না বিজু ?'

'না ত !'

কী অদ্ভুত মেয়েটা, এখনো ওর কাছে ঢাকবার চেষ্টা কর্‌ছে !

'একেবারেই চিনতে না ওকে ?'

'না।'

কী আশ্চর্য, তা'হ'লে বিজলীর সেই ডায়রীর তিন নম্বরের খোলা পৃষ্ঠাটা! কণিকা একবার পিছন ফিরে সেই নারিকেল-কুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌ল। সৌম্যেনের অপেক্ষিত বন্ধুটি এসেছে, ওরই সমবয়সী একটি ছেলে,—তার সংগে ওদিক্‌কার পথে চলে গেল।

এর মানে? তাহ'লে সে কী কোনো ভুল কর্‌ল নাকি? কণিকা ঘুরে দাঁড়ালো। কী দুর্বোধ্য ব্যাপার! হঠাৎ একটা সন্দেহ দোলা দিয়ে গেল ওর মনে।

বলল,—'আচ্ছা বিজু, তুমি কি গল্প-টল্প লেখো, বানিয়ে?'

সলজ্জ একটু হাসল বিজলী, বলল,—'হ্যাঁ, লিখি একটু-আধটু। এই ত আজ আপনি আসবার আগে একটা লিখ্‌ছিলাম।'

বুঝ্‌তে পার্‌ল এবার সব, মুহূর্তে কুয়াশা মিলিয়ে গিয়ে কণার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল সবকিছু। আর একটি-কথাও না বলে দ্রুত পায়ে পথ চলতে লাগল সে, সারা লেক্-অঞ্চলটাকেই তখন ওর ভয়ানক অসহ্য লাগ্‌ছিল!

প্রথম-প্রেমের পদধ্বনি কণার সমস্ত চেতনাকে যেন সম্পূর্ণ শিথিল ক'রে দিয়েছে!

কিন্তু কল্পনার ঢেউ উঠে কল্পনাতেই মিলিয়ে গেল। কণার চোখে ওঠে নি চশমা, হয় নি সে শিক্ষয়িত্রী,—অনুপমদাও যায় নি ডলারের দেশ আমেরিকায়।

আজকের মন দিয়ে সেদিনকার-আমিকে এ'চিন্তার জন্য বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা যায়। কেমন ক'রে কল্পনা ক'রেছিলাম কণিকার শিক্ষয়িত্রীরূপ? কীসের প্রতিক্রিয়ায়? আমার বোনকে পড়াতে আসতেন যিনি, সেই শুক্‌নো মুখ, ক্লান্ত দেহশ্রী—তাঁকে প্রতিদিন দেখতে দেখতে কেমন-যেন অবাক হ'তাম মনে-মনে! কী এক রুদ্ধ বেদনা যেন রেখায়িত ছিল সেই গম্ভীর নিষ্করুণ মূর্তিটি ঘিরে! ভাবতাম, কণা কী হ'য়ে উঠ্‌বে কোনদিন এ'রকম?

না হয় নি। একবছর, দু'বছর, তিন বছর। আমিও তখন কলেজী-জীবনের মধ্যগগনে। একদিন শাঁখ বাজ্‌ল পাশের বাড়ীতে,—যেমন হয়, সু-সমারোহে বিয়ে হ'য়ে গেল কণিকার। কী যেন বরের নাম? সুব্রতবাবু। ইতিহাসে এম্‌-এ পাশ ক'রে বেরিয়েছেন সম্প্রতি। অসাধারণ চেহারা নয়, শুধু মনে আছে চোখ দুটোর কথা। স্বপ্নিল দু'টি উজ্জ্বল চোখ। যেন সর্বক্ষণই স্বপ্ন দেখছে।

চ'লে গেল পরের ঘরণী। ছাদে-দাঁড়িয়ে-থাকা স্তব্ধ নিশ্চল মূর্তিটির মধ্যে কী প্রাণসঞ্চার হ'য়েছে? কে জানে! এক-একদিন কেমন-যেন উন্মনা মনে হয় নিজেকে, কিছুই ভালো লাগে না। মনে পড়ে একটি দিনের চিত্তচাঞ্চল্যের কথা। তখনো ওর বিয়ে হয়নি, তখনো জানি না সেই ওর অনুপমদার কথা। ছাদের আল্‌সের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কণা, আমি ওকে উদ্দেশ ক'রে লিখেছিলাম একটি চিঠি। সেই

প্রথম ও সে-ই শেষ। কী ভাবে সে'চিঠি পৌঁছেছিল বলার দরকার নেই,—কিন্তু এসেছিল ওর উত্তর,—ছোট্ট কাগজ,—মেয়েলী হাতে দ্রুত ভঙ্গিমায় লেখা,—'তোমাকে ভীষণ ঘৃণা করি।'···চিঠি নয়, যেন চাবুক।

কিন্তু আমার এই মর্মবেদনা নিয়ে আমার দৈনন্দিন সমস্যা-গুলি ব'সে নেই। বাস্তব-জীবনের দাবী দেখা দেয় প্রখর হ'য়ে। কর্মসংস্থানের চেষ্টায় অক্লান্ত ঘুরে বেড়াই। এ'দুয়ার থেকে ও'দুয়ার। ড্যালহাউসি স্কোয়ার আর ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট।

অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতরূপে আসে কর্মজীবনের আহ্বান। মহানগরীতে নয়,—দূরে,—ঘাটশিলায়। প্রকৃতির অবারিত স্নেহপুঞ্জ।

দিন যায়, কিন্তু তবু ভুলতে পারি না সেই ছাদে-দাঁড়িয়ে-থাকা বিষাদ-প্রতিমাকে। ফুলডুংরীকে ঘিরে আজ যেখানে দ্রুত বসতি উঠ্ছে,—সেখানে জনবিরল গেরুয়া পথটির পাশে একটি পুরাণো একতলা বাড়ী দেখেছিলাম। জানালা-দরজা বন্ধ, পরিত্যক্ত বাগানটায় আগাছার দল যথেচ্ছ বেড়ে উঠেছে। জানালার কোনোটায় খড়্খড়ি ভেঙে প'ড়েছে, ছাদের এককোণে দেয়াল ফেটে অশত্থ-শিশু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে!

কেন জানি না, বাড়ীটাকে দেখতে দেখতে কেবলি কণার কথা মনে হ'তো। অফিসের পর প্রায়ই বেড়াতে বেড়াতে বাড়ীটার সামনে পথের-ওপর-ঝুঁকে-পড়া প্রকাণ্ড গাছটার শিকড়ে গিয়ে বসতাম। ব'সে ব'সে দেখতাম, পশ্চিম দিগন্তে

সিদ্ধেশ্বর-ডুংরীর শিরোদেশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে,—বেলাশেষের বিদায়রাগে সমস্ত আকাশটাকে রাঙিয়ে দিয়ে!

এক-একদিন অদ্ভুত একটা চিন্তা মনটাকে পেয়ে বস্‌ত। এই নির্জন স্তব্ধ বাড়ীটা যদি আমার হ'তো? আর যদি সে আস্‌ত বেড়াতে, মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য তার কুমারীমনের কলকাকলী রেখে যেতো এ'বাড়ীর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে!

ধরা যাক্‌, সে এসেছিল। কুমারী নয়, সিঁথিতে সিঁদূরের আলো জ্বালিয়ে। কিন্তু তারপর? তারপরের কথা ভাবতে গিয়ে অস্তগামী সবিতার দিকে চোখ পড়ে। বেলা যায়। একদিন ত আমারও বেলা যাবে।

আজ থেকে বাইশ বছর পরে কী হবে? সেদিন আমি মর্তকায়ায় হয়ত থাকব না,—হয়ত সেদিন আসবে কণা,—তার স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে,—এই নির্জন নিস্তব্ধ বাড়ীটায় ওর সুখী পরিতৃপ্ত জীবন হয়ত রেখে যাবে স্বাক্ষর। হয়ত আমার কথা ক্ষণিকের জন্যও মনে পড়্‌বে। এই অদ্ভুত পরিত্যক্ত অন্ধকার বাড়ীটা যেন আমার রিক্ত মনেরই প্রতীক।

কিন্তু ধূলো জমেছে। সমস্ত রঙ্‌ সমস্ত ঔজ্জ্বল্য,—সমস্ত প্রখরতা বিদায় নিয়ে গেছে বহুদিন। মলিন বিবর্ণ অতীতের স্মৃতি-আকীর্ণ পথপ্রান্তেই কণিকা পা ফেলল এবার।

পশ্চিম দিগন্তে পাহাড়ের দীর্ঘ শ্রেণী, তারই মধ্যে স্পষ্ট চোখে পড়ে একটি ধ্যান-নিমগ্ন তপঃগম্ভীর পর্বত-সন্ন্যাসীকে।

সিদ্ধেশ্বর পাহাড়। দিগন্তের তীরে তখন শেষ প্রণামে নত হ'য়েছে পরিশ্রান্ত দিন!

'মা, ওমা, কোথায় তুমি?'

মুখ ফেরালো কণিকা। কে ডাক্‌ছে? শোভা?

'মা, তুমি এখানে? আমি খুঁজে খুঁজে মর্‌ছি।'

'কাছে আয়।'

'যায়গাটা কী সুন্দর, না মা?'

মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কণিকা বলল,—'ট্রেণ থেকে নেমেই হুটোপাটি করতে বেরিয়েছিলি ত? রজত কোথায়? কী কর্‌ছে সে?'

'জানি না। কে কী করছে না করছে, সেজন্য তোমারই বা এত মাথাব্যথা কেন?

'বলিস কী? পরের ছেলেকে সংগে এনেছি, মাথাব্যথা হবে না?'

'ঈস্, ভারী আমার পরের ছেলে! জানো মা, ঐ টিবি পাহাড়টার কাছে যেতে যেতে আমার সংগে কী তর্ক! এখন আবার এসে পিছনের বাগানে পুকুরধারে ব'সে বসে কবিত্ব ফলানো হ'চ্ছে!'

মা হাস্‌ল। শাড়ীর আঁচলটা ঠিক ক'রে নিতে নিতে শোভা বলল, 'মা, বাবা কোথায়? মণ্টু, ঝণ্টু, ছবি,—ওরাই বা কোথায়? বেরিয়েছে বুঝি? বাব্বাঃ, ট্রেণ থেকে নেমেই বেড়ানো, বাবার যেমন কাণ্ড!'

'কার বাবা, দেখতে হবে ত ?'

শোভা হঠাৎ একেবারে শিশুর মতো হাত্‌তালি দিয়ে উঠ্‌ল,—'মা-মা, দেখ-দেখ, কী রকম হল্‌দে-হল্‌দে ফুল! কী রকম বুনো-বুনো-মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ !'

'ওটা কী, জানিস ? মহুয়া।'

'এই মহুয়া!'······

তরুণ উজ্জ্বল মনপ্রাণ নিয়ে শোভা ঝলমল ক'রে উঠ্‌ল। শালের শিরে শিরে বসন্ত নেমেছে, বসন্ত নেমেছে অরণ্যে-অরণ্যে! আরেকটু এগিয়ে এলো কণিকা। ফটকের মাথায়-মাথায় কারুকার্য ছিল, কিন্তু এখন তা' নেই, চূণবালি-খসা ইঁটের নির্লজ্জ কঙ্কাল দেখা দিয়েছে! এরই একপাশে একখণ্ড পাথরের ফলকে ওর নাম ছিল স্বাক্ষরিত।

'কার নাম, মা ?'

কণিকা বলল,—'এই বাড়ী যাঁর।'

শোভা একটু থেমে সবিস্ময়ে বলল,—'এই বাড়ী তাহলে আমাদের নয়! তবে যে বাবা···।'

'ঠিকই ব'লেছেন। এই বাড়ী এখন আমার। বাড়ীর মালিক মৃত্যুকালে উইলে এ'বাড়ী আমাকে দান ক'রে গেছেন।'

'কে মা তিনি ? বলো তাঁর নাম ?'

ম্লান একটা ছায়া যেন মুহূর্তের জন্য এসে পড়্‌ল কণার মুখে, পরক্ষণেই সে'ভাব সাম্‌লে হেসে উঠ্‌ল কণিকা, বলল,—

'সবে ত মাটিতে পা দিয়েছিস্, এরই মধ্যে সব শুনে নিতে চাস? পরে বল্‌ব।'

বুড়ো-আমগাছটার পাতায় পাতায় পথের ধুলো এসে জ'মেছে। তারই নীচ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে কণিকা বলল,—'তুই যা শোভা, দেখ গিয়ে রজত কী কর্‌ছে।'

'যাচ্ছি গো যাচ্ছি, আমাকে তাড়াতে পার্‌লেই যেন বাঁচো তোমরা!'

শোভা ছুট্‌ল। কণিকা ধীর পায়ে উঠ্‌ল এসে বারান্দায়।

অরণ্যের স্বপ্নকে ভেঙে জনপদ গ'ড়ে উঠ্‌ছে। আর সংগে-সংগে এই বাড়ীও হ'য়ে উঠ্‌ছে জরাজীর্ণ। এখানে যথেচ্ছ জঙ্গল। রান্নাঘরের মাথায় অশ্বত্থ-শিশু। ছাদের কার্ণিশ প্রায় খ'সে গেছে, দেয়ালের প্রায় সবটাই নোনা-পড়া। মেঝের সিমেন্ট্‌ প্রায়শই উঠে গেছে, পায়ের তলায় মেঝেটা কর্কশ।

অনেক কষ্টের পর কাজ-চালানো-গোছের পরিষ্কার ক'রে নিতে পারা গেল খান কয়েক ঘর। শুধু চাকর-বাকরের দ্বারা কী হয়, নিজেকেও খাট্‌তে হ'য়েছে কণিকার। তা-ও কালকের জন্য রইল প'ড়ে, আজকে ট্রেণ থেকে নেমে আজকেই সব-কিছু গুছিয়ে তোলা একপ্রকার অসম্ভব।

দরজা ঠেলে একটা ঘরে ঢুক্‌ল কণিকা। ছোট পুরাণো আলমারী কয়েকটা, কাঁচগুলি গেছে বেশীর ভাগই ভেঙে। স্তূপীকৃত বই তার মধ্যে, ইঁদুরেরা যথেচ্ছাচার চালিয়েছে, একটা

বইও পুরোপুরি আস্ত নেই, তার ওপর ধূলো,—এত ধূলোও থাকতে পারে এ'রাজ্যে ?

টেবিলে এলোমেলো ইঁদুরে-ছড়ানো একরাশ কাগজ-পত্র-বই। ঘরের কোণে-কোণে ঝুল, মাকড়সার জাল। এ'ঘরটা আজ আর পরিস্কার হয় নি, কিন্তু করা উচিত ছিল।

অনেক চেষ্টার পর দক্ষিণের জানলার একটা পাল্লা খুলে ফেল্‌লো কণিকা। দিগন্তে পাহাড়ের শ্রেণী চোখে পড়ে। দিনের আলো ম্লান, বিষণ্ন। ছুটো-একটা তারা ফুট্‌ছে। আকাশের কোণে থম্‌কে আছে একরাশ লঘুমেঘ। পাখীর কাকলী ক্রমশ স্তব্ধ হ'য়ে এলো। নামল সন্ধ্যা। ঘরের ছায়া কালো হ'য়ে গেল, নোনা-ধরা দেওয়ালগুলি দেখাতে লাগ্‌ল বিচিত্র, টেবিল-চেয়ার-আলমারী,—সবই যেন ভ'রে উঠ্‌ল নিদারুণ রহস্যে !

এ'জগতের খবর যেন জানা নেই, এ'বৈচিত্র্যের সংগে যেন পরিচয় নেই,—এ'এক সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত তিমিরমগ্ন পরিবেশ !

'লক্ষ্মণ-লক্ষ্মণ !'—ডেকে উঠল কণিকা।

'যাই মা।'

'কী করছিস ? একটা আলো দিয়ে যা এ'ঘরে।'

'যাই।'

ঘন হচ্ছে অন্ধকার। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে বাইরে। ঘরের মধ্যে একটা চাম্‌চিকে একবার উড়ে এসে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল।

'কইরে লক্ষ্মণ, আলো দিয়ে গেলি ?'

'এই, যাচ্ছি।'

একটু পরেই লক্ষ্মণ এলো আলো হাতে। আলোটা রাখতে রাখতে বলল,—'মা, বাবু খুঁজছেন আপনাকে।'

'এসেছেন এতক্ষণে ?'

বল্‌তে-না-বলতেই সকন্যক ও সপুত্র সুব্রতবাবুর প্রবেশ। মেয়েটী, যার নাম ছবি, সব থেকে ছোট, বয়স সাত-আট, সবুজ রঙের ফ্রক-পরা, ছোট্ট দুটি মুঠি দিয়ে ওঁর ডানহাতখানা ধ'রে প্রায় ঝুলতে-ঝুলতেই এলো বলা যায়। পিছনে-পিছনে হাফ্‌ প্যাণ্ট্‌ ও সার্ট-পরা মণ্টু ও ঝণ্টু, বারো এবং দশ বছর বয়স ধরা যায় যথাক্রমে।

'রামো-রামো, এই ঘরের মধ্যে ঢুকে চুপচাপ্‌ ব'সে আছ। ঈস্‌, কী ধূলো আর ময়লা রে বাবা !'

ঝংকার দিয়ে উঠ্‌ল কণিকা,—'কে আস্‌তে বল্‌ল তোমাকে এ'ঘরে ?'

একটা চেয়ার টেনে ধূলো মুছে ততক্ষণ ব'সে প'ড়েছেন সুব্রতবাবু, বললেন,—'গরজে ঢেলা বয় ! বিছানা পেতে সাজিয়ে রেখেছ বটে, কিন্তু দেখেছ তার অবস্থা, ভদ্রলোক শুতে পারে ? এখন ব্যবস্থা একটা করো ? যে ধূলো উড়ে বেড়াচ্ছে, বাপ্‌স্‌!'

'এই ছবি, বইগুলি হাঁটকাস্‌ নি, ছিঁড়ে ফেল্‌বি। আঃ, এই মণ্টু, দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াচ্ছিস্‌, জামাটা ময়লা হ'য়ে যাবে

যে! ঝন্টু, এদিকে আয়। একী চুলগুলি এলোমেলো করলি কী করে?'

ছবি বাবার কোলে জাঁকিয়ে ব'সেছে ততক্ষণে, বলল,—'আমরা কতো বেড়ালাম, না বাবা? মা ভীষণ বোকা, বেড়াতে পেলো না, কী মজা!'

'ঠিক কথাই ত—'সুব্রতবাবু হেসে উঠলেন,—'বোকা নইলে কেউ অমন হাঁড়িমুখো হ'য়ে ব'সে থাকে!'

'খুব হ'য়েছে! আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেপিলেগুলোর মাথা খেলেন একেবারে! ছেড়ে দাও ওদের, খাইয়ে আনি, এখ্‌খুনি ঘুমিয়ে পড়বে। মন্টু, দেখ্ ত বাবা, তোর দিদি আর রজতদা কোথায়? ডেকে নিয়ে আয়, খেয়ে নিক্। নাও, ওঠো দেখি। এই ছবি, নাম কোল থেকে!'

'উঁহু!'—সুব্রতবাবু বললেন,—'পাদমেকং ন গচ্ছামি। জল-হাওয়ার গুণে ভাব-টাব আসতে পারে ত? গোল ক'রো না, ভাব আস্‌ছে!'

বাপের চিবুক ধ'রে ছবি ব'লে ওঠে, 'বাবা, ভাব কী?

'অনেকটা ডাব বলা যায়। বাইরে কিছু নেই, ভিতরে টলমল করছে সুস্বাদু পানীয়।'

হেসে ফেলল কণিকা,—'বয়সের নেই গাছপাথর, তবু ছেলেমি গেল না! এই ঝন্টু কোথায় যাচ্ছিস?'

'দাদা ডাকছে।'...ঝন্টু পালালো মন্টুর পিছনে।

'নাও, ওঠো শীগ্‌গির, আলো নিয়ে চল্‌লাম।'

ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে উঠে পড়লেন সুব্রতবাবু, বললেন,—'আয়রে ছবি, ফাঁসীর হুকুম হ'য়েছে!'

'ঢং!'—কণিকা এগিয়ে চল্‌ল,—'মেয়ে বড়ো হ'য়েছে, দু'দিন বাদে জামাই আসবে, এখনো হুঁস্ নেই!'

'জামাই আসবে কি গো! এসে ব'সে আছে বলো। রজত বেচারী তোমার আর তোমার মেয়ের পাল্লায় প'ড়ে……!'

'আঃ, হ'চ্ছে কী!'—চাপা গলায় একরকম ধ'ম্‌কেই উঠ্‌ল কণিকা,—'ঐ ওরা আসছে, শুনতে পাবে যে!'

কিন্তু শুনতে ওরা পায় নি। জলতরঙ্গের একটা যেন ঝংকার তুলে শোভা রজতের আগে-আগে ছুটে এলো, বলল,—'মা, শোনো রজতদার কথা! এখানকার পাথর নাকি কথা কয়, পাথরের নাকি ভাষা আছে!'—

ব'লেই হাসতে লাগল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে।

রাত তখন অনেক। ঘুম আসছে না কণিকার। পাশেই ঘুমিয়ে ছবি। ওপাশে ঝণ্টু, তারপরে সুব্রতবাবু, এপাশে ওর কোল ঘেঁসে শোভা। পাশের ঘরে শুয়েছে মণ্টু আর রজত। অন্য ঘরে ঠাকুর আর চাকর।

ভালো লাগ্‌ছে না কণিকার। মনে হ'চ্ছে ট্রেণের দোলাটা এখনো ওঁর মস্তিষ্কের কোষে-কোষে রিম্-ঝিম্—রিম্-ঝিম্—একটানা ক্লান্ত সুর তুল্‌ছে! বাইরের বাগানে পাণ্ডুর জ্যোৎস্না,

জানালার ফাঁকে ফাঁকে তারই আভাস। কাঁঠালী চাঁপার গন্ধ ভেসে আস্‌ছে।

পাশ ফিরতেই শোভার গায়ে হাতটা ঠেকে গেল। আহা, কী হাত-পা ছড়িয়েই না শুয়ে আছ মেয়েটা! বড়ো হ'চ্ছে আর ধিঙ্গিপনা বাড়্‌ছে! কী হঠাৎ দুর্বোধ্য এক অকারণ ক্রোধে জ্ব'লে উঠ্‌ল কণিকা। তীব্র বিদ্বেষে মেয়ের দিকে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে উঠে পড়্‌ল সে। কমিয়ে-দেওয়া লণ্ঠনের শিখাটা বাড়িয়ে দিলে একটু। তারপরে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুল্‌ল,—সেই ধূলি ম্লান বিবর্ণ বইয়ের ঘর! কবাটটা ভেজিয়ে দিয়ে আলো হাতে ভিতরে এলো কণিকা।

এ'ধারে বই—ওধারে বই, চারিদিকে বই আর বই! একটা পৈশাচিক উচ্ছৃঙ্খলতা যেন তার দিকে তাকিয়ে নিদারুণ বিস্ময়ে নিঃঝুম হ'য়ে ব'সে আছে! কাদের নির্বাক্ জটলায় বিঘ্ন ঘ'টেছে যেন, চাপা অসন্তোষে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠ্‌ল যেন কারা, কারা যেন অস্ফুট গুঞ্জন তুলে বলতে লাগ্‌ল,—অনধিকার-প্রবেশ ক'রেছ, এ'তোমার অধিকারের সম্পূর্ণ বাইরে!

হঠাৎ-ই হাতে লেগে ধপ্‌ ক'রে একটা বই প'ড়ে গেল মেঝেতে। আর সেই অতর্কিত শব্দটুকুতেই আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌ল কণিকা। কে-কে!

কেউই না। প'ড়ে-যাওয়া-বইটা হাতের ওপর তুলে নিলো। সম্ভবতঃ ব্রাউনিঙ্‌। বইখানার ভাঁজে ছোট্ট একটা ময়লা

কাগজ,—মেয়েলী হাতের বাঁকা অক্ষরে বাঙ্‌লায় লেখা,— 'তোমাকে ভীষণ ঘৃণা করি !'

দিনের আলো নিভে গিয়ে রাত্রি আসে। ঝিঁ-ঝিঁ-ডাকা অন্ধকার রাত। ফিরে আসি। নির্জন বাড়ীটা নির্জনই থাকে,— কোনদিনই জাগে না কাকলী।

নিজের চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে নিজেই কৌতুক অনুভব করি। কোথায় কণিকা, কোথায় সুব্রতবাবু! কেমন হ'য়েছে কণার বিবাহিত জীবন, কে জানে! কণা কী ভুলতে পেরেছে ওর সেই অনুপমদাকে ?

কিন্তু আমি কেন ভুলতে পার্‌ছি না! কণা আমার কে ?

একাকী ঘুরে বেড়াই, বন্ধুরা পরিহাস করে। ছুটীর দিনে যেখানে থাকি, সেই পল্লীর পায়ে-চলা পথ ধ'রে আন্‌মনে হেঁটে যাই, একটি বিশেষ বাড়ীর সম্মুখীন হ'লেই সঙ্গীদল পরিহাসে মুখর হ'য়ে ওঠে। বলে,—'একটি ভালো মেয়ে আছে এ' বাড়ীতে, বিয়ে করবে ?'

পথ ছেড়ে সরে আসি। শুধু বেঁধে ফেলে,—গান। কখনো-সখনো চল্‌তে-চল্‌তে অতর্কিতে গান শুনি। প্রাণময় ভারী সুরেলা সেই মেয়েলী কণ্ঠস্বর! মাঝেমাঝে সুরভঙ্গী কেমন-যেন উদাস মনে হয়। এক-একদিন জানতে ইচ্ছা করে, মেয়েটী কী আমারই মতো কোনো ব্যথার স্পর্শ পেয়েছে ? আমারই মতো কী না-পাওয়ার-বেদনায় করুণ হ'য়ে আছে ওর মন ?

বন্ধুরা বোঝে না, আমার এই থ'ম্‌কে-দাঁড়ানোকে দুর্বলতা মনে ক'রেই মুখর হ'য়ে ওঠে নিষ্ঠুর কৌতুকে। এ'কাণ থেকে ও'কাণ,—সমস্ত পল্লীটাই একদিন গুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে আমাকে আর মেয়েটীকে নিয়ে নানান্ কল্পনায়!

কিন্তু মেয়েটীর কথা বলার আগে কণিকার কথা বল্‌বার দরকার। যা' শেষ হ'য়ে গিয়েও শেষ হয়নি আমার জীবনে। কল্পনা করতাম ওর যৌবন-প্রান্তের চেহারাটাই। এর পিছনে আমার মনের কী ক্রিয়া আছে, মনস্তত্ত্ববিদ্ তার যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করুন,—কিন্তু আমার মনে হয়,—আমার দেখা সেই ছাদের-আলিসায়-দাঁড়ানো তরুণী-মূর্তিটি অপর কোনো পুরুষের পাশে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হ'য়েছে,—এ'যেন আমার অবচেতন মনের কাছেও সহ্যের অতীত! তাই কল্পনা ক'রেছি ওকে বিগত যৌবনা শিক্ষিকার রূপে,—ভেবেছি ওকে কোনো সংসারের গৃহিণী-রূপে,—যার কন্যা,—অষ্টাদশী,—শোভা।

অথচ, বাস্তবজীবনে ওর প্রথম সন্তান হ'য়েছিল,—পুত্র,—কন্যা নয়। যেদিন চর্মচক্ষে কণিকাকে অপ্রত্যাশিতরূপে আবার দেখলাম,—সেদিন ও' পুত্রের জননী,—ওর বড়োছেলে মণ্টু তখন আঠারো বছরের তরুণ। স্বামীপুত্র-পরিবৃত ওর সংসারে ওকে যে এ'ভাবে শেষ পর্যন্ত ঘাটশিলাতেই আবিষ্কার করব,—এ'আমি কোনদিনই ভাবতে পারি নি। তখন আমারও বয়স হয়েছে যথেষ্ট, আমারও জীবনে এসেছে অনেক পরিবর্তন,—ও'চাকরী ছেড়ে অন্য চাকরী নিয়ে এদেশ-ওদেশ ঘোরাঘুরি ক'রে

বেড়াচ্ছি,—একবার ছুটীর অবকাশে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আহ্বান পেলাম ঘাটশিলা যাবার। যেতে ইচ্ছাও হ'লো। সেই পুরানো ঘাটশিলা! সেই সিদ্ধেশ্বর-ডুংরী আর সুবর্ণরেখা।

ঘাটশিলায় অতর্কিতেই সাক্ষাৎ হ'লো। অতর্কিতেই পেলাম পরিচয়। একেবারে আমার বন্ধুর পাশের কোয়ার্টারে। মৌভাণ্ডারের কারখানা-সংলগ্ন অঞ্চলেরই মধ্যে। দারিদ্র্যের আগুনে ঝ'ল্‌সে-যাওয়া কণিকাকে কী আমারই চিন্‌বার কথা?

আমার পরম সৌভাগ্য, আমাকে ওরা কেউই চিন্‌তে পারেনি, কণাও না। এক কাপ চা খেলাম, নবপরিচিতের মতো সুব্রত-বাবুর পাশে তক্তাপোষে ওপর ব'সে কতো শুনলাম অফিসের কাহিনী সুব্রতবাবুর মুখে। তাকের ওপরে দেখলাম ধূলো-পড়া বইয়ের গোছা,—হয়ত'বা পোকায় কাটা-ও। কচি-কাঁচাদের চীৎকার আর কান্না,—তারই মধ্যে ঘোমটা-পরা গৃহিণী এসে চা দিয়ে গেলেন,—শীর্ণ দু'টি হাতে লোহা আর শাঁখা! আমার সাহস হয় নি ওর দিকে মুখ তুলে তাকানোর।

ভালো লেগেছিল মণ্টুকে। খুব কম কথা বলে, সময় পেলেই চ'লে যায় সুবর্ণরেখার তীরে,—একা—একা। তরুণী কণিকার বিয়ের সন্ধ্যায় সুব্রতবাবুর যে দু'টি স্বপ্নময় উজ্জ্বল চোখ দেখছিলাম,—সেই চোখেরই দৃষ্টি যেন জেগে আছে মণ্টুর চোখে।

কণিকার থেকেও কষ্ট হ'য়েছিল সুব্রতবাবুকে দেখে, সুব্রত-বাবুকে বুঝে, সুব্রতবাবুর পরিচয় পেয়ে। যে ঘটনার কথা

লিখ্‌তে যাচ্ছি,—তার ভূমি যা-ই থাক, ভূমিকা অবশ্য এমন-কিছু অসামান্য নয়। ইতিহাসের এম-এ আজ দেড়শো টাকার কেরাণী। ঐতিহাসিক আজ কারখানার ধ্বনির সংগে জড়িয়ে ফেলেছে জীবনকে। তাকের ওপর বোঝাই-করা ধূলো-পড়া পোকায়-কাটা বইগুলির ওপর মাঝে-মাঝে চোখ পড়ে। কতগুলি অর্থহীন কঙ্কালের মতো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা,—যাদু-ঘরে রেখে দেওয়া প্রাগৈতিহাসিক কোনো নিদর্শনের মতো।

বাড়ী আর অফিস, অফিস আর বাড়ী। সুব্রতবাবু সাধারণতঃ বেড়াতে কোথাও যান না। এ'যায়গাটা নাকি বেড়াবার পক্ষে চমৎকার, নতুন যাঁরা আসেন তাঁদের কাছ থেকে বহুবার শোনা গেছে এ'রকম অভিমত। নতুন এসে এককালে সুব্রতবাবুও হয়ত ঐরকম কোন মতই প্রকাশ ক'রে থাকবেন, কিন্তু এখন তার কোনো সাড়াই নেই। রবিবারের হাটে যেতে দূরের শ্রেণীবদ্ধ পাহাড় চোখে পড়ে কিন্তু অবসন্ন মন নিয়ে সুব্রতবাবু নির্বিকার।

'ওগো শুনছ ?'

শোনবার আশায় গৃহিণীর দিকে মুখ তোলেন সুব্রতবাবু, উচ্চারণ করেন, 'বলো।'

'বলব আমার মাথা আর মুণ্ডু! সেই থেকে চুপচাপ্‌ বসে আছো, একটা কিছু বিহিত করো ?'

'একেবারে এখ্‌খুনি! অফিস থেকে এলুম, একটু জিরুতে দাও ?'

'তা' জিরোও না, যতখুশী জিরোও, আমারই হয়েছে যত মরণ, ছেলেপুলেদের দেখোরে, শোনোরে, বকোরে,—সব করার বেলাতেই আমি,—ছেলেমেয়েগুলো যেন আমারই একার! আমিও দিতে পারি ও'রকম আল্‌গা।'

'একটু বোসো, যাচ্ছি আমি, খানিক বিশ্রাম নিতে দাও।'

'ওরে আমার বিশ্রাম রে! যাবেন ত সাততাড়াতাড়ি দাসবাবুর বাড়ীতে দাবা খেলতে ফিরবেন সেই রাত্তির দশটার আগে নয়,—কীর্তি ত আর আমার জানতে বাকি কিছু নেই—খালি আড্ডা, আড্ডা! বাপই এইরকম, তা' ছেলেগুলো আর হবে না-ই বা কেন!'

কথাটা অবশ্য খুব যে অতিরঞ্জিত তা নয়। দাশবাবুর বাড়ীতে দীর্ঘসময় দাবা খেলায় ডুবে থাকা, এটা সুব্রতবাবুর একরকম অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেছে।

'মতলবটা কী বলো দেখি? এরকম খোঁচা দিয়ে কথা বলার অর্থটা কী?'

'ওরে বাপ্‌রে! বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কোর! ওঁর সংগে আমি খালি মতলবই ক'রে বেড়াই—আমারই হয়েছে মরণ, সাতজন্ম পাপ করে ওঁর ঘরে এসে ঢুকেছি!'

উঠে বসেন সুব্রতবাবু, বলেন, 'ঘাট হয়েছে। এখন কী ক'রতে হবে?'

'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে, সীতা কার পিসি! কাগজখানাতে কী ছাই লেখা আছে তা মাথায় ঢুকবে কি একটাও?'

মণ্টেটার কাণ ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে টানতে টানতে ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাইয়ে আনো, বুঝলে ? কী ঘেন্নার কথা, সতেরো আঠারো বছরের পুঁচকে ছেলে, গুচ্ছের যাচ্ছে তাই নভেল প'ড়ে প'ড়ে ডেঁপো হ'য়ে উঠেছেন ! হবে না-ই বা কেন, শাসন আছে একটুও ? বাপের শাসন না থাকলে কী ছেলেপিলে মানুষ হয় ? বাপ ত এদিকে চোখ কাণ বুজে দাবার আড্ডায় মত্ত।'

ব্যাপারটা এই। প্রতিবেশী হরি মুখুজ্যের চতুর্দশী কন্যার উদ্দেশ্যে আর কিছুই নয়—নিতান্ত দুর্বল আর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় লেখা একখানি পত্র—গুরুগম্ভীর গলায় যাকে বলে প্রেমপত্র—এবং সেটি লিখেছেন আর কেউ নয় শ্রীমান্ মণ্টু। পত্রখানি ও'পক্ষের অভিভাবকদের কাছ থেকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এ'পক্ষের অভিভাবকদের কাছে।

সুব্রতবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'মণ্টেটা কোথায় ?'

'পোড়াকপাল আমার, সে'খবরটাও রাখো না ! সেই সাত সকালে আমার বকুনি খেয়ে বেরিয়েছে বেলা গড়িয়ে গেল, এখনো ফেরবার নামটি নেই। তাইত' বলছি, মুখ গুঁজরে আড্ডায় পড়ে না থেকে দয়া করে একটু খুঁজে বের করে আনো হতভাগাটাকে।'

'কোথায় আবার যাবে ? হয়ত কোন বন্ধু-টন্ধুর বাড়ী গিয়ে বসে আছে।'

'সে কি আর আমি খুঁজতে বাকি রেখেছি ? এই বিনি

কোথায় গেলি, বলনা তোর বাপ্‌কে, কুশীদের বাড়ী, কানাইদের বাড়ী সব যায়গায় ওরা খুঁজে এসেছে কোথাও নেই।'

'সে কী !'

'আমারই হয়েছে মরণ ! একটু বেরোও না, পা-খানাকে একটু চালিয়েই নিয়ে এসো না, লজ্জায় হতভাগাটা কী আর কারুর বাড়ি গিয়ে ঢুকবে ? একটু নদীর ধারে টারে যাও,— ছেলের ত মাঝে মাঝে আবার ভাব ওঠে, চুপচাপ একা একা গিয়ে ব'সে থাকে নদীর ধারে কিম্বা জঙ্গলের মধ্যে। সাঁওতালদের ঐ গাঁ-টাও একবার দেখো, ওখানেও যায় কিন্তু মাঝে মাঝে।'

আর একটি কথাও না ব'লে সুব্রতবাবু পথে এসে নামলেন।

কোয়ার্টারগুলোর রাস্তা ছাড়িয়েই এক-ফালি সবুজ মাঠ, তারপরেই শালবীথির অরণ্য, তার মধ্যেই সাঁওতালদের গ্রাম। উঁচু নীচু অসমতল ভূমিতে বহুদিন পরে সুব্রতবাবুর পদপাত ঘটল।

এক ঝলক মৃদু আর ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগে। দূরে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের মাথার কাছে অপূর্ব বিভায় সূর্য রক্তিম হ'য়ে আছে আর একটু পরেই অস্তমিত হবে। বাঁদিকে সুবর্ণরেখা, এখান থেকে নদীর ক্ষীণধারা চোখে পড়ে না। শুধু একটা দীর্ঘ আর গভীর খাদ ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে।

শালবীথির অরণ্যে ঢাকা সাঁওতালদের গ্রাম। যারা

ঝড়ে যাবার তারা ঝড়ে গেছে, শালের বুকে নবপল্লব, শ্যাম সমারোহে যৌবনের অভিযান চলছে। একটি পায়ে চলা পথকে অবলম্বন করলেন সুব্রতবাবু। ঝরা পাতা মর্মরিত হয়ে উঠলো।

সাঁওতালদের ঘরগুলো ছোট্ট-খাটো, কিন্তু ভারী পরিষ্কার, —ঝক্‌ঝকে। কয়েকটা ঘর পার হয়ে একটা বাঁকে পড়তে, সুব্রতবাবুর হঠাৎ ভাল লেগে গেল। একটু দাঁড়ালেন। ক্ষুদ্র গ্রামখানার একেবারে প্রান্তে এসে পড়েছেন তিনি। সামনে একটা সংকীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে নীচে নেমে গিয়ে আবার উঠে গেছে। সুব্রতবাবু আরও এগিয়ে গেলেন।

মণ্টেটাকে যে সাঁওতালদের গাঁয়ে এখন কিছুতেই পাওয়া যাবে না, এরকমই একটা ধারণা করছিলেন। তিনি ভাব-প্রবণ ছেলে। ওকে কী এখন পাওয়া যাবে ঐ বদ্ধ পরিসর ক্ষুদ্র সাঁওতালদের গাঁয়ে! হয়ত ছেলেটা চুপ্‌চাপ্‌ কাটিয়ে দিচ্ছে বৈকালটা নদীর গর্ভে কোনো পাথরের ওপর বসে অথবা ক্ষুদ্র কোন ঝর্ণার ধারে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন সুব্রতবাবু। কে একটি সাঁওতালি মেয়ে আস্‌ছে, খোঁপায় ফুল কণ্ঠে গান। 'নদীর ধার কোনদিকে বলতে পারিস ?'

'হাইদিকে।'

আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ ক'রে মেয়েটি অসস্থত হয়। সুব্রত-বাবু এগিয়ে যান। দুইদিকে টিলা মাঝখানে পায়ে চলা পথ

এঁকে বেঁকে চলেছে। চমৎকার নির্জন আর নিস্তব্ধ জায়গাটা। সুব্রতবাবু চুপ্‌চাপ্‌ দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

'তুমি আমার কল্পনা! যে প্রেরণা তোমার কাছে থেকে পাচ্ছি, সারাজীবন তা' আমার মস্ত সম্পদ্‌ হয়ে থাকবে! হে করুণাময়ী, তোমার কাছে আমি ঋণী রইলাম।'

অদ্ভুত ছেলে এই মণ্টু! কেমন ক'রে যে এটুকু ছেলে এই চিঠি লিখে উঠ্‌তে পারল অমন গুছিয়ে,—সুব্রতবাবু ভেবে অবাক হয়ে যান। প্রেরণা! প্রেরণা! কী এমন পেলো হরি মুখুজ্যের ঐ এক ফোঁটা মেয়ের কাছ থেকে, যা সারাজীবন তার কাছে হ'য়ে থাকবে একটা মস্ত সম্পদ!

দূরে পাহাড়ের শ্রেণীর অন্তরালে সূর্য অস্তমিত হল। কী অপূর্ব এই জনহীন অবকাশ,—মোহময় নিস্তব্ধতা!

কিছুটা অগ্রসর হতেই একটা বাঁক। বাঁকটা পেরিয়ে খানিকটা ঢালু জমি। জমির পরেই মসৃণ বালুর স্তূপ। আর তারপরেই,—এ-কী!

অপূর্ব রাজ্য! পাষাণ এখানে স্বপ্ন দেখছে! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিন্ন ছিন্ন পাষাণ স্তূপ,—অসংখ্য নুড়ী, মাঝে মাঝে কোথাও এক টুকরো বালুর স্তর, কোথায় বা কাকচক্ষু টল্‌টলে স্নিগ্ধ জল। কোনো কোনো প্রস্তরখণ্ড তরঙ্গাকৃতি,—ঢেউয়ের পর এসেছিল ঢেউ, তারই ইতিহাস সযত্নে ধরে রেখেছে! কোনো কোনো মসৃণ প্রস্তরে অসংখ্য দুর্বোধ্য রেখা,—কী এক প্রাগৈতিহাসিক না জানা ভাষার ঐশ্বর্য যেন! কোনো কোনো পাষাণ-স্তূপে

পরিষ্কার পদচিহ্ন আঁকা, কে এক মহানুভব অতিথি এসেছিলেন একদিন,—তাঁরই পায়ের চিহ্নটুকু নিদারুণ আগ্রহে এঁকে রেখেছে! সবটা মিলিয়ে হয়ত কিছুই নয়,—কিন্তু কী এক পরম অর্থ নিয়ে চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছে এরা!

সুব্রতবাবু এগিয়ে যেতে লাগলেন। আর তাঁর পায়ের কাছে নুড়ীগুলো নড়ে উঠ্‌ল। ওরা মানুষের নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতির হাতে গড়া। তাই মানুষের কল্পনার সংগে ওদের মিল নেই। কিন্তু তবু ওরা ঐতিহাসিক নিদর্শন। সে ইতিহাস মানুষের নয়, মানুষের কীর্তিকাহিনীর নয়, সে ইতিহাস প্রকৃতির। প্রকৃতির রাজ্যে কত কী বিবর্তন ঘটে গেছে, তার ইতিহাস কেউ লেখে না,—সেই না লেখা ইতিহাসেরই হয়ত এক স্মরণীয় পৃষ্ঠা এই অপূর্ব রাজ্য!

সন্ধ্যা নামছিল। দু'একটা পাখীর ডাক, আরও দূরে অস্পষ্ট কলগুঞ্জন। এখানে আরও কি কেউ এসেছে? একটা মসৃণ পাথর খণ্ড, তার ওপর উঠে বস্‌লেন। নীচে স্বচ্ছ নীল সুবর্ণরেখার ধারা। অন্তর উচ্ছসিত হয়ে উঠছে। এখানে কি আগে কোনও দিন এসেছিলেন তিনি? মনে পড়ে না। কে জানে কি এ জায়গাটার নাম!

কলগুঞ্জন স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল সত্যিই কারা যেন আসছে এগিয়ে। না, না, কেউ নয়ত, তবে ও শব্দ কিসের? হয়ত কোনো লুকানো ঝর্ণা, তারি কল্লোল আস্‌ছে ভেসে। যেন সংগীত, যেন এক মন প্রাণ আচ্ছন্ন করা কোনও সুর!

ঘুম পাড়ানী গান শুনতে শুনতে শিশুরা যেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে, তেমনি ঐ সুর তার সমস্ত চেতনাকে ব্যাপ্ত করছে। আর সেই সুর-ব্যাপ্ত অন্তর দিয়ে সুব্রতবাবু প্রকৃতিকে অনুভব করতে লাগলেন। সম্মুখে অরণ্য, তারপরেই ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী সিদ্ধেশ্বর পাহাড়! স্বপ্নাচ্ছন্ন আকাশ আর বাতাস আর সেই সুর! 'রাত্রি এসে···!' একী, মানুষের কণ্ঠস্বর! সুব্রতবাবু একটু ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলেন, কয়েকটি স্ত্রীপুরুষ আসছে এগিয়ে, তাদেরি মধ্যে একজন, খুব সম্ভবত মেয়ে, গাইতে গাইতে আসছে। তারই কণ্ঠ!

'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে,
তোমায় আমায় দেখা হ'ল সেই মোহানার ধারে!···'

অতি অদ্ভুত অতি চমৎকার লাগল এই গান। রাত্রি এসে দিনের পারাবারে সেই মোহানায় মিশল, সেখানে দেখা হল কার সংগে? কে সে?

'কে আপনি এখানে বসে? শুনছেন?'

টর্চের ক্ষীণ আলো এসে পড়ল। সুব্রতবাবু চমকে বললেন 'কে?'

'কিছু মনে করবেন না। আমরা নতুন লোক। বেড়াতে এসে পথ ভুলে ঘুরে মরছি। কোন্‌দিকে পথ বলতে পারেন?'

'পথ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মৌভাণ্ডারের রাস্তা ব'লে দিলেই আমরা চিনে যেতে পারব বাসায়।'

অতি অদ্ভুত লাগল। পথ খুঁজছে? তা-ও ওঁর কাছে! সুব্রতবাবু হঠাৎ কিছু উত্তর দিতে পারলেন না।

'আচ্ছা দেখুন নদীর ধার দিয়ে দিয়ে গেলে আমরা রাস্তায় উঠ্‌তে পারব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবেন বইকি।'

'ধন্যবাদ।'

আবার একটু পরে। 'শুনছেন?'

'বলুন?'

'কিছু মনে করবেন না, আপনি কি মৌভাণ্ডারেই থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, আপনি সুব্রত চৌধুরী ব'লে কাউকে চেনেন?'

'সুব্রত চৌধুরী! কেন বলুন ত? কী দরকার! আমিই!'

'By Jove! আপনি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সমগ্র দলটি ওঁর কাছে ঘন হ'য়ে এলো।

'ঘাটশীলায় নেমেই আমরা আপনার খোঁজ করছি। আমরা হচ্ছি কলকাতার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী। ঘাটশীলায় এসেছিলাম বেড়াতে। প্রফেসর মজুমদারকে চেনেন ত? তাঁর কাছ থেকেই শুনি আপনার নাম। প্রাচীন তক্ষশীলা এবং ভারতের বাইরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে আপনি গবেষণা করছিলেন। 'হারানোদিন' বলে আপনি সম্পূর্ণ নতুন ধরণে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করছিলেন।

তার প্রথম খণ্ড আমরা পড়েছি। কিন্তু এর পরের খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয় নি কেন? এযে বাংলা দেশের এক অপূর্ব জিনিষ সৃষ্টি হচ্ছিল!

ইত্যাদি অনেক কথা। সুব্রতবাবু শুন্‌তে পাননি। আরও অনেক কথাবার্তা ব'লে দলটি কখন যে বিদায় নিয়ে গেল, সুব্রতবাবু জানেন না। কী এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিতে সমস্ত চেতনা ছেয়ে গেছে। যখন চমক ভাঙল, তখন রাত কতো কে জানে! অন্ধকার অপসারিত করে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠছে।

ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করছিলেন। কিন্তু কীসের ইতিহাস?

'খ্রীষ্টীয় ৪৪ অব্দে পার্থিয়ানদের রাজত্ব চলেছে তক্ষশীলায়। তখন রাজা ছিলেন ফ্রাওটিস্। সেই সময় টায়ানার অ্যাপোলোনিয়াস্ তক্ষশীলা পরিদর্শন করেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়'......

'ব্রতীদা, ও ব্রতীদা? এই বিকেল বেলায় মুখ গুঁজে বসে লিখ্‌ছ কী? চলো, চলো?'

একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। পরণে ফিকে নীল বর্ণের ঝল্‌মলানো একটা শাড়ী। সমস্ত মুখ উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় ভরে গেছে, দুই চোখে অপূর্ব জ্যোতি! তরুণ সুব্রত কলম ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বললে, 'চলো।'

'কোথায় যাবে?'

'নদীর ধারে।'

ওরা বসেছিল স্রোতস্বতী নদীটির কিনার ঘেসে। সুব্রত বল্‌লে, 'তোমাদের দেশ সত্যিই চমৎকার।'

'আমাদের দেশ? আর তোমার নয় বুঝি?'

'ঐ হলো। কতটুকু থাকতে পাই দেশে? কলকাতা শহর আমাদের গ্রাস করছে।

'তোমার কলেজ খুলছে কবে ব্রতীদা?'

'শীগ্‌গিরই। আর দিন পনের পরেই দেশত্যাগী হচ্ছি।'

একটুক্ষণ চুপ। তার পরে বললে, 'দেখ দেখি, আমার এমন শাড়ীটা চোরকাঁটায় ভরে গেছে। এখন ছাড়ায় কার সাধ্য?'

'আমাকে দিও। ছাড়িয়ে দেবো।'

'দূর। তুমি কোথায় ঘুরবে তক্ষশীলার রাস্তায় রাস্তায়, তা নয় ছাড়াতে বসবে চোরকাঁটা! কী যে বলো? সত্যি ব্রতীদা, তুমি কতো বড়ো, আর তুলনায় কতো ছোট আমি!'

'কে বললে তুমি ছোট! যদি কোনওদিন জীবনে বড়ো হয়ে ওঠা সম্ভব হয়, তা হ'লে তার গৌরব সম্পূর্ণ প্রাপ্য তোমার! যে প্রেরণা তোমার কাছ থেকে পাই, তার মূল্য কি কখনও নিরূপণ করা যাবে?'

একটা হাত তুলে নিয়েছিল হাতে, বলেছিল 'তুমি বড়ো হবে, কেউ রোধ ক'রতে পারবে না তোমার পথ। ব্রতীদা, তুমি যে আমার সাধনা করছ! তুমি যে সাধক!'......

এর পরে কিছুকাল কেটে গেছে। কলকাতার ঘরে সারাদিনটা বই আর খাতার মধ্য দিয়ে তখন কাটছিল সুব্রতর। সপ্তম শতাব্দীর তক্ষশীলার যে বিবরণ দিয়ে গেছেন হুয়েন স্যাঙ,—ওর মন তারই মধ্য দিয়ে তখন পথ হাঁটছিল। এমন সময় এলো চিঠি। প্রজাপতির ছাপ বসানো রঙিন একটি পত্র, আর কিছু নয়।

তারপর চ'লে গেছে,—বহু মাস, বহু বৎসর। সময়ের স্রোত বয়ে চ'লেছে। এক তীর ভেঙে, এক তীর গড়ে,—ভাঙা গড়ার খেলা চ'লছে অবিরাম।

সুব্রতবাবু উঠে দাঁড়ালেন। কোথায় রাজা আম্ভী রাজা পৌরভ? কোথায় ইউমেনিস্, ম্যাপোলোডোটাস্ অ্যান্টিয়াল-সিডাস্, কাজ্জলা, কণিষ্ক, হুবিষ্কের দল!...

সুব্রতবাবু আচ্ছন্নের মত চলতে লাগলেন। আকাশের তারা কোন্ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখ্ছে কে জানে! সম্মুখে দেখা যায় কতগুলি গাছ জটলা ক'রে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সেখান থেকে আলো জ্বলে উঠ্ল। ঐ অন্ধকার থেকেই আলোর বিন্দু এগিয়ে আসতে লাগ্ল! এই নির্জন নদীতীরে, পাহাড়, অরণ্য, নক্ষত্র নীহারিকা, আর ঐ সঞ্চরায়মান আলোর বিন্দু। এই চির-চেনা জগতের বুকে আর এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জগৎ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে যেন! সুব্রতবাবু দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। ঐ আলোর বিন্দু তাকে তুনিবার আকর্ষণে টান্ছে!

অকস্মাৎ কী একটা শব্দ জেগে উঠ্‌ল। এই নিস্তব্ধ নির্জন প্রান্তর শিহরিত হ'য়ে উঠল যেন! দূর থেকে ভেসে আসা একটা শব্দের বেশ। প্রাণপণে এগিয়ে চল্‌লেন সুব্রতবাবু। সেই আলো সেই আলোর বিন্দু! তন্দ্রাচ্ছন্ন, মোহাচ্ছন্ন পথিকের মতো পথ পার হতে লাগলেন সেই ঈষৎ কম্পিত আলোর শিখা কাছে আসতে লাগ্‌ল, কাছে, অনেক কাছে!

'বাবা ?'

সাড়া নেই।

'বাবা ? এই যে বাবা, ওরে ভুখন এদিকে আয়, এই যে বাবা!'

'কে !'

'আমি বাবা, আমি মণ্টু। সেই থেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই রাতে আপনি এখানে এসে একা একা বসেছিলেন!'

'মণ্টু ?'

'হ্যাঁ, বাবা। এই ভুখন বাবাকে ধর। সাবধানে উঠবেন বাবা, বালিতে পা ডুবে যাবে। এই যে, ঠিক হয়েছে, এইবার আমার হাতটা ধরুন।'

'মণ্টু ?'

'কী বাবা ?'

'কোথায় গেছলি ?'

'ফুলভুতুরির ওদিকে বেড়াতে। সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসে

শুনি আপনি নেই। রাত হয়ে গেল দেখে আমি আর ভুখন খুঁজতে বেরিয়েছি।'

সস্নেহে হাতখানি রাখলেন ছেলের মাথার ওপরে,—বললেন 'মণ্টু ?'

'কেন, বাবা ?'

'একটু দাঁড়া।'

ফিরে তাকালেন। সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিন্ন ছিন্ন প্রস্তরের স্তূপ !

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপরে বললেন,—হ্যাঁরে, এ যায়গাটার নাম কী রে ?'

মণ্টু বললে,—'রাতমোহানা।'

শেষ হ'য়ে গেল কণিকার কথা। কিন্তু কণিকার এ'সমাপ্তির পূর্বে নিজের কথা আছে। আমার সেই প্রস্ফুটিত প্রথম যৌবনের আনন্দ আর বেদনার মুহূর্তগুলি !

তখনো ঘাটশিলায়। ছুটির দিন একা-একা বাসায় ব'সে আছি জানালার সামনে শুভ্র কুর্চিফুলের পুষ্পিত গাছটার দিকে তাকিয়ে, বন্ধুরা কোলাহল করতে করতে ঘরে ঢুকত,—জোর ক'রে হয়ত টেনে নিয়ে যেত ওদেরই কারুরই বাড়ীতে। যাবার পথে পার হতে হ'তো সেই বাড়ীটা, যে-বাড়ীর মেয়েটিকে আর আমাকে নিয়ে সমস্ত পল্লী মনোমত কাহিনী রচনায় বিশেষ তৎপর। কৌতূহল হ'তো। ভাবছে কী মেয়েটিকে কে জানে ! এ'সব কথা ওরও কানে গেছে নিশ্চয়।

উপার্জন করলেও সংসারের দৈনন্দিনতার উত্তাপ তখনো তেমন ক'রে স্পর্শ করে নি। মার হাতে মাসের শেষে তুলে দেই উপার্জন,—সংসারের চক্র কোনক্রমে গড়িয়ে চলে যায়!

কিন্তু, যে কথা বলছিলাম। ওদের জানালার কাছে ছিল আতা গাছের কুঞ্জ। তারই আড়াল থেকে কাণে আসত গানের গুন্‌গুনানি অথবা কথাবার্তার কয়েকটি টুক্‌রো।

যা' বল্‌তে যাচ্ছি, তা' সম্ভবতঃ পাঠক সম্প্রদায়ের প্রায় সবার জীবনেই একবার-না-একবার ঘটেছে। ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে একদিন,—অতি সাধারণ ঘটনা,—হঠাৎ পায়ে অনুভব করলাম তীব্র দংশনের যাতনা! না, কোনো বিষধর সরীসৃপ নয়,—'জুতোর পেরেক'। সময়-সময় আপনাদের পায়েও ফোটে। কিন্তু ঠিক এরকম অবস্থায়? অর্থাৎ যে-মেয়েটিকে আর আপনাকে জড়িয়ে পাড়াপড়্‌শীর মাধূর্য-রচনার শেষ নেই, ঠিক তারই বাড়ীর সামনে যদি পায়ের ফিতে-বাঁধা জুতো এ'ভারে দংশন করে—কেমন হয় আপনাদের মানসিক অবস্থা? এর ওপর যদি আপনার কাণে আসে আতা-কুঞ্জের আড়াল থেকে টুক্‌রো হাসি আর টুক্‌রো কথা?

সে যে কী অপ্রস্তুত অবস্থা, তা' বলার নয়! বাড়ী এলাম বটে, কিন্তু ঘটনাটি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। লজ্জা আর মাধূর্য, একাধারে দুই-ই মেশানো। অপূর্ব সে' অনুভূতি!

মেয়েটী যেমন ঠিক তেমনটি তাকে রেখে নিজেকে কল্পনা করলাম ক'লকাতার পরিবেশে। পাঁচ বছর পরে যেন ঘট্‌ছে

ঘটনাটা। যেন উন্নতিও ক'রেছি আর্থিক। আমার ক্ষুদ্র পুরাণো চেহারার বাসাটা যেন দক্ষিণ ক'লকাতার এক বাড়ী, ওদের বাড়ীটাও যেন কাছে! সবই যেন দক্ষিণ কলকাতার পরিবেশ। লেকের সান্নিধ্য। কণাদের বাড়ীটা যেন কল্পনায় হ'য়ে গেল ওদের বাড়ী। কণার, এক দাদা ছিল, তার কথা কখনো বলি নি, তাকে যেন কল্পনা করলাম ঐ মেয়েটার দাদা-রূপে। কী নাম যেন? হ্যাঁ, সৌরেশবাবু।

সৌরেশবাবুর আহ্বানে যেন ওঁদের বাড়ী চ'লেছি সেদিন। কেন যে এই সু-সমারোহে আহ্বান, তা' আমি বুঝি। কিন্তু একদা আকাঙ্খিত ঐ মেয়েটাকে দেখলে আমার হিন্দুস্থান পার্কের সুরমা সান্যাল অথবা লাভ্‌লক্‌ ষ্ট্রীটের মীনাক্ষী মজুমদারকে মনে পড়ে। যতই ভাবছি, ওদের তুলনায় মেয়েটাকে ততই দীন মনে হ'চ্ছে আমার কাছে। সৌরেশবাবু আজ কী বলবেন, আমার জানা। বলব, স্পষ্ট ক'রেই বলব,— আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার বোনের যোগ্যতর পাত্র আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।

ওঁদের বাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল, কড়া নাড়ালাম। পকেটের সিল্কের রুমালখানা একবার বার করবারও সময় পেলাম না, আমার ঠিক সামনেই দরজাটা খুলে গেল। একুশ-বাইশ বছরের একটি ছেলে, বলল,—কাকে চান?

উত্তর দিলাম,—সৌরেশবাবুকে।

—কোথা থেকে আস্‌ছেন,—আপনার নাম?

বল্‌লাম।

—ওহো, আপনি! আসুন—আসুন, ভিতরে আসুন।

বইপত্র-একপাশে-গুছিয়ে-রাখা একটি টেবিলের সামনেকার আরাম-কেদারা নির্দেশ ক'রে ছেলেটী বলল,—বসুন?

বস্‌লাম। ছেলেটী বলল,—দয়া ক'রে যদি একটু অপেক্ষা করেন, সৌরেশদা মার্কেটিং-এ গেছে, এখুনি ফিরবে।

—বেশ ত।

—কিছু মনে করবেন না, আপনি ততক্ষণ বইটইগুলো একটু দেখুন, আমি ভিতরে চায়ের কথা ব'লে আসি।

বলতে যাচ্ছিলাম, থাক্, ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন? কিন্তু আমার বলবার আগেই ভদ্রলোক দেখি দরজার পর্দার আড়ালে অপসৃয়মান।

পর্দা ঈষৎ আন্দোলিত হলো। তিনি চলে গেলেন। মুহূর্তের ফাঁক দিয়ে দেখলাম,—নিটোল সুডৌল দু'খানি চুড়িপরা নমনীয় হাত, চঞ্চল কৃষ্ণ দৃষ্টি।

কী একটা বই তুলে নিয়ে কয়েকটা লাইন এগিয়েছি, হঠাৎ কাণে এলো এক টুক্‌রো হাসি আর চাপা কণ্ঠস্বর। আমি কাণ পাত্‌লাম।

—কই, অপর্ণা কই, তোমার বর এসেছে যে?

—যাঃ-ও!

—অপর্ণার তপস্যা সার্থক এতদিনে! মহাদেবের ধ্যান

ভঙ্গ হ'লো, দেখ্‌ছ না কতো শীগ্‌গির শীগ্‌গিরই এসে উপস্থিত হ'য়েছে।

—যাও, কী যে হাসাহাসি করো তোমরা!

আবার একটু হাসি। কিছুক্ষণ আরও-নীচু-স্বরে কয়েকটা কথা—বোঝা গেল না। তারপর,—

—মাসীমা চা করছেন। অপর্ণা, তোমার বরকে চা আর খাবার দিয়ে এসো।

—ঈস্, ব'য়ে গেছে আমার। বর না হাতি?

—সে কী! সব ঠিক্‌ঠাক্,—আজ বাদে কাল বিয়ে,—বর না কীরকম?

—বাজে ব'কো না। ব'য়ে গেছে আমার ঐ চালিয়াৎ-টাকে বিয়ে করতে!

কথাটা কৌতুককর লাগ্‌ল। আমি বেশ-বাসে পরিচ্ছন্নতা ভালবাসি বটে, কিন্তু তা' বলে উগ্রতা নেই আমার মধ্যে একথা নিঃসংশয়ে বল্‌তে পারি।

—আচ্ছা, অপর্ণা, একে নয় তাকে নয়, তবে কা'কে বিয়ে করবে শুনি?

—কাউকে না।

—সত্যি?

—একশোবার সত্যি। সেই ঘাটশিলা থাকতে এই দু'বছর ধ'রে দাদাকে কীরকম ঘোরাচ্ছে ঐ লোকটা, তা' জানো?

—জানি। বৃহৎ ব্যাপারে বৃহৎ বাক্যব্যয় হ'য়েই থাকে, সেটা খুব অপরাধ নয়।

—হাজারবার অপরাধ। মানুষের মন নিয়ে খেলা, সোজা কথা নয়!

—তাই নাকি! মনের খেলাও হ'য়ে গেছে,—এ'ত জানতাম না!

—দেখ ননীদা, ফাজ্‌লামো ক'রোনা।

ওরে বাস্‌, খুব যে রাগ দেখছি! অতি রাগ অতি অনুরাগের লক্ষণ কিন্তু, মনে রেখো।

—বিরক্ত ক'রো না, দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দেবো, ব'লে দিচ্ছি।

—তা' হ'লে ত ষোলোকলা পূর্ণই হয়। তুমি অপর্ণা, আর উনিও বিশ্বনাথ,—বিশ্বনাথ না হয় অপর্ণাকে নিয়ে আরেকবার বিশ্ব পরিক্রমা করবেন, তা'তে আর কী, তবে এই ইতরজনদের জন্য মিষ্টান্নের কথাটা ভুলো না কিন্তু।

—আমাকে জড়িয়ে ও'লোকটার কথা আর তুলো না ননীদা, আমার হাড়শুদ্ধ জ্বালা ক'রে ওঠে।

বইখানা হাত থেকে নামাই। ওদের সমস্ত অভিযোগেরই সুষ্ঠু উত্তর দিল আমার পক্ষ থেকে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ তুলে লাভ কী? কোনো ক্ষেত্রেই অতি সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে নেই। আত্ম-উদ্‌ঘাটন স্থান, কাল এবং পাত্র-সাপেক্ষ।

হঠাৎ এই সময় ভিতরের পর্দাটা ঈষৎ কেঁপে ওঠে, প্রবেশ করেন সেই ভদ্রলোক, হাতে চা-জলখাবারের ট্রে।

—সর্বনাশ ক'রেছেন! ওকী!

—না-না এ-তো কিছুই নয়। আর তাছাড়া এ'তো আমাদের কর্তব্য।

ভদ্রলোকের সংগে আরও হু'চারটে সাধারণ ভদ্রতা-সুলভ কথাবার্তা হ'লো। একটু পরেই এলেন সৌরেশবাবু, আমাকে দেখে ব'লে উঠ্‌লেন,—এই, যে! কিছু মনে করবেন না, কয়েকটা জিনিষ কিনতে গিয়েছিলাম, দেরী হ'য়ে গেল।

—না-না, তার জন্য কী।

এই রকম আরও কয়েকটা সাধারণ কথাবার্তা। একসময় আমিই ব'লে ফেললাম,—

—দেখুন, আমাকে একটু সকাল-সকাল উঠ্‌তে হবে।

—ও, হ্যাঁ,—ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—কইরে, পান নিয়ে আয়।

পানের বদলে দেখা দিলেন সেই ভদ্রলোক, বললেন,—সৌরেশদা, একবার ভিতরে এসো ত?

আন্দরে গেলেন সৌরেশবাবু। আমি একা প'ড়ে রইলাম ঘরে। কয়েকটি ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তা। তার খানিকক্ষণ পরে কাণে এলো সেই ভদ্রলোকটির কণ্ঠস্বর,—তুমি তা'হলে কা'কে ঠিক বিয়ে করতে চাও, বলো ত অপর্ণা?

—কাউকে না।

ঐ বিশ্বনাথবাবুকেও না?

—ঈস্, ব'য়ে গেছে আমার!

—তবে, কাকে ?

—বল্‌ব না।

তারপরেই ভদ্রলোক আরেকটি প্রশ্ন করলেন। অতি স্পষ্ট হ'য়েই সে প্রশ্নটা আমার কাণে এসে বাজ্‌লো। 'অপর্ণা' নামধারিনী মেয়েটী খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌ল, বলল,—উঃ মাগো কী দুষ্টু ই না হ'য়েছ তুমি ননীদা !

মেয়েটী হেসে উড়িয়ে দিলেও ভদ্রলোকের প্রশ্নটি আমার বই-ওল্‌টানোকে ততক্ষণে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। 'আমাকে ?'—বাইশ বছরের ছেলেটীর এই প্রশ্ন আমার কাণে অতি স্পষ্ট আর অতি তীব্র হ'য়েই এসে লাগ্‌ল।

আর ঠিক তারপরেই সৌরেশবাবু, এবং তাঁর পিছনে-পিছনে পান হাতে নিয়ে প্রবেশ করল অতি আকস্মিক আর কেউ নয়, সেই মেয়েটী সুডৌল সুগঠিত যার হাত দু'খানি, চোখের তারা যার ঘন কালো।

মেয়েটী পর্দার আড়ালে অপসৃত হ'তেই সৌরেশবাবু বলতে আরম্ভ করলেন তাঁর সেই বহু-প্রতীক্ষিত প্রয়োজনীয় কথাটা। যা ভেবেছিলাম ঠিক তা-ই, এমন কি বলবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত আমার কল্পনার সংগে হু-বহু মিলে গেল।

আমি নয়, আমার মধ্য থেকে আর একজন যেন এ'-কথার উত্তর দিলো,—আমার অমত নেই। তবে মাকে একবার—

—তার জন্য ভাববেন না, চিঠি লেখালেখি ত চ'লছেই,

তার ওপর আমি নিজে তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে এসেছি সেদিন, তাঁর সম্পূর্ণ মত আছে।

—আমারও অমত নেই।

কিন্তু এ'তো পাঁচ বছরের পরের পরিণতি,—তা-ও কল্পনা। তার মাঝের দিনগুলিকে ভুলবার নয়,—নানান্ রঙে রাঙানো, নানান্ ছন্দে বেজে-ওঠা,—নানান্ আলোতে এলোমেলো।

আতাকুঞ্জের আড়ালে লুকানো সেই হাসি-উচ্ছল মেয়েটী অপরিচয়ের তমসা পেরিয়ে ক্রমশঃ কাছে এলো আমার কাছে— আসা শুধু নয়,—এ'যেন একটি ফুল-ফুটে-ওঠা,—অপূর্ব এক অনুভূতির ক্রম-উদ্ঘাটন!

প্রথম-প্রথম মেয়েটী আসত মায়ের কাছে। মার টুকিটাকী গৃহকাজ সাহায্য করত কখনো-সখনো, গল্পও করত নানারকম,— ওদের বাড়ীর বেড়ার ধারে দুটো নারকেল গাছ সমান্তরাল উঠে গিয়ে মাথার কাছে এসে পরস্পরের দিকে ঝুঁকে প'ড়েছে,— তারই একটা কোটরে এসে বাসা নিয়েছে কয়েকটি টিয়াপাখী; কাঠ্‌ঠোক্‌রা এসে ঠুকে ঠুকে এত ক'রে তৈরী করল কোটর,— সেই কোটরে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ল টিয়া! এই কথা মাকে বলতে বলতে হেসে হেসে উঠ্‌ছিল অপর্ণা,—আমার ঘরে বসে ওর এ'ধরনের অজস্র গল্প শুনতাম ওর সেই কারণে-অকারণে খুসী-হ'য়ে-ওঠা হাসির তরঙ্গ-রোল!

ধীরে ধীরে একদিন মায়ের ঘর থেকে এলো আমার ঘরে।

প্রথম আলাপের কথা সকলেই নানান্ রঙে নানান্ ভঙ্গিমায় লিখে রাখে, কেউ মনে-মনে, কেউ বা দিনপঞ্জীতে। দিনপঞ্জী লুকিয়ে লুকিয়ে আমিও লিখে থাকি,—কিন্তু প্রথম আলাপ-লগ্নের সেই আলোছায়ার সুষমা, সেই সলজ্জ অথচ আগ্রহান্বিত বাণী-বিনিময়,—সে শুধু সঞ্চিত হ'য়ে থাক্ আমারই মনের মণি-কোঠায়,—তাকে ভাষায় আকার পর্যন্ত দিতে ইচ্ছা কর্‌ছে না! সে' অতি-তুচ্ছ, অতি-ঘরোয়া ঘটনা একান্ত আমারই হ'য়ে থাক্।

এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমরা ক্রমে ক্রমে পরস্পরের কাছে সহজ হ'য়ে এলাম। পার হ'য়ে গেল বেশ কয়েকটা দিন।

একটা রবিবারের কথা বলি। ঘুম ভাঙ্‌তে ভীষণ বেলা হ'য়ে গেছে সেদিন। কারখানার অফিসে সাড়ে-ছটা-চারটের কর্তব্য ক্রমাগত ছয়দিন ক'রে যাবার পর একটা দিনের বিরতি শুধু নয়,—শনিবারের রাত জেগে দিনপঞ্জী লিখছিলাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধ'রে,—রবিবারে ঘুম ভাঙ্‌তে দেরী হওয়ার এটাও অন্যতম কারণ।

বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে যে কথা সবার আগে মনে পড়্‌ল, সেটা আমার দিনপঞ্জীর কথা। শিয়রের কাছে কলমটা র'য়েছে, কিন্তু আমার প্রতিদিনকার ছোঁয়া-লাগা গাঢ় নীলরঙের মলাটের সেই মোটা বাঁধানো খাতাটা নেই। বালিস সরিয়ে, তোষক উল্টে,—বিছানা তচ্‌নচ্ করলাম,—কিন্তু নেই আমার

খাতা। মা অনেক সময় বিছানা তুলতে এসে ওটা প'ড়ে আছে দেখলে বইয়ের তাকে বইয়ের ওপর তুলে রাখে,—কিন্তু কই, তাকেও ত ওটা নেই? গেল কোথায়? নিলো কে? মা ত কখনো এ'সব পড়ে না!

তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে গেলাম। শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ছাদে ব'সে বড়ি দিচ্ছে মা, গায়ে জড়ানো মোটা চাদরটা এলিয়ে প'ড়েছে,—'মা' 'মা' ক'রে ডাক্‌তে ডাকতেই ছাদে উঠেছি,—মুখ ফিরিয়ে মা বলল,—কী রে?

—আমার সেই মোটা খাতাটা কোথায়? নিয়েছো?

মা অবাক হ'য়ে বলল,—সে কী রে! আমি নিতে যাব কেন?

কে নিলো তবে?

হঠাৎ-ই চোখ পড়্‌ল। মার আড়ালে গোলাপী পশমী-চাদরে ঢাকা আরেকজন যতদূর নত হওয়া যায় ততখানি নত হ'য়ে মুসুর ডালের বড়ি দিচ্ছিল ছোট-ছোট ক'রে,—ওর চাদরের রঙের সংগে বড়িগুলোর রঙেরও অশ্চর্য মিল!

বুঝ্‌লাম, এ' চৌর্যকার্য কার হ'তে পারে! গভীর মনোযোগে বড়ির বিন্দুগুলো সারি সারি সাজিয়ে যেন এক অতি দুর্বোধ্য ছবি-আঁকতেই সে ব্যস্ত,—আর কোনদিকে মন নেই!

বললাম,—মা ওকে জিজ্ঞাসা করো ত?

মা কিছু বলবার আগেই ওর মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—বারে!

আবার বললাম,—মা, জিজ্ঞেসা করো দেখি, ও' নিয়েছে কি না!

অমনি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো সে,—দেখুন দেখি মাসীমা, আমি নেবো কেন? আমি ত সেই ভোর থেকেই আপনার কাছে, ছাদে,—আমি ও'সব খাতার কী জানি?

হাসি লুকিয়ে পরমুহূর্তেই নীচে চ'লে এলাম। জানি, ও-ই নিয়েছে। কিন্তু ডাকাত ত কম নয়! ঘুমন্ত ব্যক্তির শিয়র থেকে খাতা নিয়ে উধাও হওয়া! মেয়ের 'সাহস' আছে বল্‌তে হবে! মার আড়ালে না থাকলে দেখে নিতাম!

কিন্তু যা' মনে-মনে আশা করছিলাম, তা' হ'লো না। ভেবেছিলাম, মার হাত-জোড়া, মা হয়ত ওকে বলতে নীচে এসে আমাকে জলখাবার পরিবেশন করতে। ওর বদলে খাবার নিয়ে নিজেই এলো মা,—বলল,—ছিঃ বিশু, অমন ক'রে কথা বলতে হয়! আমি নয় মা, কিন্তু পরের মেয়ে তোমার অতো ঝক্কি পোয়াবে কেন? অপর্ণা বোধ হয় মনে-মনে রাগ ক'রেই খিড়্‌কী খুলে চ'লে গেল।

বলতে চেয়েছিলাম,—পরের মেয়েরাই ত পরের ছেলের ঝক্কি পোয়ায় মা!···কিন্তু বল্‌লাম না মুখ ফুটে মনের কথা। আজও সময় হয় নি,—আরও আর্থিক সাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন,—তারপরেই মার কাছে মুখ ফুটে এ'ধরণের ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলা চলে।

কিন্তু এই-ই বা কী রকম কথা? খাতাটা নিয়েছে কি না,

এটা জিজ্ঞাসা করামাত্রই অপরাধ হ'য়ে গেল? আসুক আজ দুপুরে,—প্রশ্ন করতেই হবে।

কিন্তু সারা দুপুর ছট্‌ফট্‌ ক'রে ক'রে কেটে গেল,—এলো না। এটা ওটা পড়বার জন্য তাকে থেকে নামিয়ে খাটের ওপর স্তূপাকার করলাম,—বাইয়ের বল্মীকস্তূপের মধ্যে যেন শীর্ণকায় বাল্মীকি!

বন্ধুরা এসে এই উপমা দিয়েই ঠাট্টা করল. তারপর টানতে টানতে নিয়ে গেল ব্যাড্‌মিণ্টন-ক্লাবে। কিন্তু মন কী বসে? সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই কী-একটা ছুতো ক'রে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। দরজা খোলাই ছিল, নিজের ঘর পেরিয়ে মার ঘরের দিকে যেতে গিয়েই কাণে এলো অপর্ণার কণ্ঠস্বর। মার কাছে কী সব গল্প করছে,—হাসির টুক্‌রো মেশানো কী-সব তুচ্ছ ঘটনার বিস্তার!

আলোটা জ্বালিয়ে খাটের দিকে তাকাতেই চ'মকে গেলাম। মা বিছানা বিকেলেই পেতে রাখে,—সেই পাতা বিছানায় শিয়রের বালিশের কাছে প'ড়ে আছে আমার হারাণো দিনপঞ্জীর খাতাখানা!

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলাম খাতা। যতটুকু লিখেছিলাম, সেই পাতাটা খুলতেই ভাঁজ-করা একটা কাগজ চোখে পড়্‌ল। খুলে ফেলতেই বুঝ্‌লাম ব্যাপারটা। ভালো-লাগা ত বটেই, একটা খেলার নেশারও যেন আস্বাদ পেলাম। ওর লুকিয়ে পাঠানো কাগজটায় আঁকা-বাঁকা মেয়েলী ছাঁদে লেখা

ছিল ছোট্ট তুটি লাইন মাত্র,—তা-ও সম্বোধনবিহীন, স্বাক্ষর-বিহীন,—কে কাকে লিখছে,—তৃতীয়পক্ষের বোঝবার উপায় নেই। লেখা ছিল,—খাতাগুলো আগেই আমার চুরি ক'রে পড়া উচিত ছিল। কণা কে? এ'যে কণার কথাই সাতকাহণ দেখছি, কিন্তু অধমকে নিয়ে শেষকালে টানাটানি কেন? ...চিঠিটা, চিঠিই একে বলা যাক্,—রেখে দিলাম লুকিয়ে আমার হাতবাক্সে,—কিন্তু এর উত্তর ওর হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় কেমন ক'রে? ইচ্ছা হলো রঙীন কাগজে কিছু লিখি,—কিন্তু কোথায় পাবো রঙীন কাগজ? প্যাড্ কিনতে হ'লে দোকানে ছুট্তে হয়। কিন্তু দোকান থেকে আসতে আসতে ও'যদি চ'লে যায়? যাবার আগেই ওর হাতে দিতে হবে উত্তর। সাদা কাগজেই শুরু করলাম,—আমারও সম্বোধন-স্বাক্ষর রইল না,—লিখলাম,—মনে নেই বোঝা যাচ্ছে, মন থাকলে বুঝ্তে পারা যেতো, সাতকাহণ কণাকে নিয়ে নয়,—সাতকাহণ আরেকজনকে নিয়ে। সেটা যে বুঝ্বে, এক কাহণের কণায় তার ভয় কী?

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' খানা লাইব্রেরী থেকে আনা ছিল, চিঠিটা তার পৃষ্ঠার মধ্যে লুকিয়ে বইটা হাতে নিয়ে মাকে ডাকতে ডাকতে মার ঘরে গিয়ে পড়্লাম। এবেলাও সেই গোলাপী চাদরখানা গায়ে, অধিকন্তু পরনের শাড়ীখানাও লাল। বললাম, —এই যে।

মুখখানা যেন নীচু হ'য়ে গেল। মা বলল,—কখন এলি?

এই মাত্র।

ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম—মার কাছে সকালে শুনলাম, তুমি নাকি রাগ করেছ ?

তেমনি মুখ নীচু করেই বলল,—চোর বললে রাগ হয় না ?

—ক্ষমা চাইছি। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বই পড়্তে দিতে চাই। নেবে ?

মা ব'লে উঠ্ল,—বই নেবে বলেই ত ব'সে আছে এতক্ষণ। সেই কখন এসেছে বিকেলে ! হেসে বললাম,—এখন ত সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল ! পৌঁছে দিতে হবে বুঝি ?

তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্ল মেয়েটি,—মাসিমা, আপনি চলুন না ? অনেকদিন যান না আমাদের বাড়ী।

—তা' বটে,—মা বলল,—রান্নাও হ'য়ে গেছে। হ্যাঁরে, যাবো ?

বললাম,—তা' যাও না।

—তাহ'লে চল্ মা পর্ণা, ঘুরেই আসি। তোর বৌদি কী রান্না করছে দেখে আসি।

উঠে দাঁড়ালো দুজনে। ওকে বললাম,—দত্তা পড়্বে নাকি ?

নিতান্ত উদাসীনের মতই বলল,—দত্তা আমার পড়া।

—পড়া ?

একটু থেমে বলল,—আচ্ছা দিন, বৌদিকে দেব পড়তে। ও' পড়ে নি।

এইখানে ব'লে রাখি কারুর সামনে ও' আমাকে 'তুমি' ক'রে বলেনা,—এ' অভিনয়ে বোধ হয় মেয়েরাই পটু।

'দত্তা' চলে গেল। জানি, উত্তর কালই আসবে। এইভাবে চিঠির বিনিময়,—অপূর্ব এক খেলায় মেতে গেলাম!

এলো উত্তর যথাদিনে যথারীতি,—বুঝলাম। কিন্তু আমাকে নিয়ে খাতায় কী-সব লেখা হয়েছে? আমি কী ও-সব ব'লেছি নাকি! আমার দাদার নাম সৌরেশ নয়,—ননী-ই বা কে? কল্পনা-বাস্তবে মিলিয়ে এভাবে ছবি-আঁকার উদ্দেশ্য কী? পরোক্ষে কী প্রস্তাব যে করতে চাও, বুঝেছি,—কিন্তু আই-এ পরীক্ষাটা প্রাইভেটে দেবার চেষ্টা করছি, সেটা নিশ্চয়ই জানা আছে,—এটা উত্তীর্ণ হবার সংবাদ পাবার আগে পর্যন্ত উচ্চবাচ্য ক'রো না।

এর উত্তর দিলাম এইভাবে,—পরীক্ষা অমারও সামনে। অর্থনৈতিক পরীক্ষা। সেটা পার হবার আগে পর্যন্ত তুমিও উচ্চবাচ্য ক'রো না।

লিখল,—বারে, এযে উল্টো চাপ! কে কাকে উচ্চবাচ্য করতে বারণ করে! কিন্তু সে'যাক্, খাতাটা আবার চুরি করবার সময় কী এসেছে? নতুন কিছু স্বপ্ন দেখলে? আমাকে নিয়ে কী যে কখন লিখে ফেলবে, ভয় হয়! একটা কথা বলি, নিজের কথা ত খুব পারো বলতে,—আমাদের কথা বলতে পারো? দেখি ত কেমন মনের খবর রাখো?

উত্তর দিলাম,—অপেক্ষা করো। শীগ্‌গিরই তোমার কথা লিখব। একেবারে কথার পরে কথা সাজিয়ে ছবিই আঁকবো তোমার। বৃহস্পতিবার, লক্ষ্মী পূজার প্রসাদ নিতে এসে

এ'চিঠি পাচ্ছ রবিবার সকালে এসে তেমনিভাবেই ঘুমন্ত লোকটির শিয়র থেকে খাতা চুরি ক'রে নিয়ে যেও।

শুরু করলাম। ও যেন চিঠি লিখ্‌ছে কণাকে। কণার আর ও' যেন দুই সখী। ছোটবেলার বন্ধু। লিখ্‌ছে,—ভাই কণাদি, লোকে যে বলে বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা পর হয়ে যায়, একথা তুই একেবারে হাতে-হাতে প্রমাণ করে দিলি, আজ প্রায় ছয় মাসের ওপর তোর বিয়ে হয়ে গেল, বিদেশে ছিলাম বলে নিমন্ত্রণটা তো ফাঁকি দিলিই, এর মধ্যে মনে করে একখানা চিঠিও দিতে নেই! ধন্য বাবা মেয়ে তুই, বরের সুন্দর মুখখানা পেয়েছিস ত সর্বস্ব ঢেলে দিয়ে বসে আছিস!

যাই হোক, তুই ত আর খোঁজ-খবর নিবি না, আমিই খোঁজ-খবর দেই। দাদা যখন এখানে বদলি হলেন, তখন ডাক ছেড়ে কান্না আসছিল, তোদের ছেড়ে—কলকাতা ছেড়ে থাকব কেমন করে! কিন্তু না ভাই, যায়গাটা মন্দ নয়, ধীরে ধীরে মন বসছে। বর কেমন হয়েছে তা ত আর জানালি না। যাক্‌, আমিও আর সাধব না, যা কর্তব্য বুঝবি, তাই করিস। এমন একদিন ছিল যখন তোর কথা আমাকে না বলে তুই তৃপ্তি পেতিস না, আমিও তৃপ্তি পেতাম না, আমার সব কথা তোকে না বলে। কিন্তু এখন অকপটে সব বলতে গিয়ে দ্বিধা আসছে —সেই দিনগুলি কী আর ফিরে আসবে?

দাদাকে তো চিনিস, কী ভয়ানক আমুদে আর হৈ-চৈ-মার্কা লোক। আবার সংগে বৌদিটাও জুটেছেন ভালো, যেমন দেব

তেমনি দেবী,—সারাদিনরাত ধরে কী যে হাসাহাসি আর হুটোপাটি চলে এ-বাড়ীতে, তা চোখে না দেখলে বোঝানো দায়! এসব সত্ত্বেও বৌদি-লোকটা আমাদের মোটামুটি মন্দ নয়। তবে চুপি চুপি তোকে বলি, বৌদিটা ভয়ানক ফাজিল! আবার আমাকে শুদ্ধু ওর দলে টানতে চায়!

একদিন হয়েছে কী জানিস, প্রায় মাস দুই আগেকার কথা বলছি। বিকেলবেলা। জানলার কাছে বসে চুল বাঁধছি, এমন সময় বৌদিটী এসে কী বলল জানিস? বললে—পর্ণা, দেখি তোর ক্ষমতা, একটা কাজ করতে পারবি?

—কী কাজ?

মুখ টিপে টিপে বৌদিটী হাসছিল, বললে,—রাস্তার দিকে চেয়ে দেখ।

দেখলাম। আমাদের জানলার পাশেই একটা আতা গাছ, সেই জন্য বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না—জানলায় কেউ আছে কি না; কিন্তু আমার ভারী সুবিধা আড়ালে বসে আমি অনেকটা দূর পরিষ্কার দেখতে পাই। বললাম,—দেখলাম ত, হলো কী?

বৌদি বললে,—ঐ-যে পায়চারী করছে ছেলেটা দেখছিস? —উদাস-উদাস ভাব—

—আহা, ওকে ত চিনি।

বৌদি দুষ্টুমির হাসি হাসতে হাসতে বললে,—দেখি ক্ষমতা, ওকে তোর প্রেমে ফেলতে পারিস?

সত্যি বলছি কণাদি, হাসতে হাসতে আমার দম ফেটে যাবার উপক্রম হল। ঐ ত ভারী একটা ছেলে, তার নাকে দড়ি দিতে দরকার হয় আবার ক্ষমতা! বৌদি আচ্ছা হাসিয়েছ যাহোক। ওর দোষই-বা কী, ও ত আর জানেনা, এদিকে ভেতরে ভেতরে কী লীলা চলছে!

আমি প্রায়ই সকলের দিকে অথবা বিকেলে এখানে বসে গুন-গুনিয়ে গান গাই ত—বোধ হয় কানে গেছে কোনক্রমে—সেই থেকে সত্যি বলছি ভাই—রোজ বিকাল বেলা—ঠিক এইখান দিয়ে হেঁটে যাওয়া চাই! আমি নিজের মনেই হাসি আর ভাবি,—মরেছে ছেলেটা!

—আ মর, হেসেই অস্থির!

—হাসব না? ঐ ত ভারী একটা ছেলে·····।

বৌদি একটু হাসল, বলল,—তোর দাদার সঙ্গে আলাপ হয়েছে ছেলেটির, তোর দাদা তো যাকে বলে মুগ্ধ!···ওকি হাসছিস যে আবার?

—ছেলেটা কী চালাক! অন্দরে প্রবেশ করবার পথ খুঁজছে!

বৌদিও হাসল, বলল,—তোর দাদা বলে, ও-সব ছেলের মধ্যে নাকি মোহ বলে কোন জিনিস নেই!

—কেন ছেলেটি কী একেবারে!

—কে জানে-কী! তোর দাদা জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কী করেন? উত্তরে বলেছিল, কিছুই বিশেষ করি না, তবে

পিতৃদত্ত কিঞ্চিৎ আছে, তাই নিয়ে কোনক্রমে পথ চল্‌ছি !… এই রকম আরও কী সব মাথা মুণ্ডু !

—বুঝেছি, দাদা এই কথাবার্তা শুনেই মজে গেছে। —হায় রে কপাল, আজকালকার ঐ শিকারী ছেলেগুলাকে চেনো না ত,'—গোটাকয়েক মানানসই কথা মুখস্থ রাখে, আর সুযোগ বুঝে ফেলে টোপ্‌। দু'দিন বাদে শুনবে, বলছে—আমি কবিতা লিখি ! ওরা মনে করে, দু'টি কবিতা লিখেই মেয়েদের মন জয় করবে ! কেউ কেউ শিখে রাখে আবার খানকয়েক বাছাবাছা ন্যাকামীর গান ! আরে বাপু, মেয়েরা কী এতই বোঝে, তোমাদের ছলাকলা কিছুই বুঝতে পারে না ?

—সাবাস্‌, পুরুষ চরিত্র অধ্যয়নে আমাকেও হার মানালি পর্ণা।

হাসলাম, বললাম,—দেখলেই বোঝা যায় কে কেমন ছেলে ! আচ্ছা বৌদি, নামটা কী, দাদাকে জিজ্ঞাসা কর নি ?

করেছি বই কী, নাম হচ্ছে বিশ্বনাথ ব্যানার্জী। বামুন। আমরাও বামুন, ব্যাপারটা যদি অনেক দূরই গড়িয়ে যায় ত ভাববার কিছু নেই, পালটী ঘর,—অনায়াসেই বিয়ে হতে পারবে।

—আঃ, বৌদি ! তুমি কী ক্ষেপেছ ! আমি বিয়ে করব ঐ লোকটাকে ! ঐ মেয়ে-শিকারী ছেলেটা হবে আমার স্বামী ! তার চেয়ে গলায় দড়ি যে অনেক ভালো ! আমার স্বামী হবেন শিবের মত, সব দিক দিয়ে তিনি হবেন সংযমী, নিস্পৃহ,—যাঁকে চেষ্টা করে জয় করতে হবে। আর জানো—ঐ বিশ্বনাথ ব্যানার্জীর কাণ্ড ?

বৌদিকে আস্তে আস্তে সব বলে দিলাম, কান পেতে আমার গান শোনবার চেষ্টা করা, ইত্যাদি-সব। বৌদি হেসে ফেলল, বললে,—এতো কাণ্ড! আর তুই আদাকে কিছু জানাস্‌নি! তোর দাদা ওকে আবার চায়ে নিমন্ত্রণ করেছে।

তারপরে ভাই কণাদি,—চায়ের নিমন্ত্রণে ত লোকটির সঙ্গে বেশ করে আলাপ করলাম। কী বলব ভাই, সব কথা লিখতে আমারই লজ্জা করছে। আমি গাইলাম,—সে কী প্রশংসা! এর কিছু পরে একদিন সরাসরি বাড়ীর মধ্যে এসে হাজির। বললে,—দাদা আছেন?···আমি তো হেসে বাঁচিনে—একেবারে দাদা! যতদূর সম্ভব মুখের ভাব স্বাভাবিক করে বললাম,—দাদা বাইরে গেছে, এখ্‌খুনি আসবে। আপনি আস্থন বসবেন। বলব কী ভাই, ভদ্রলোক বিনা দ্বিধায় ঘরের মধ্যে এসে বসলেন। মনে মনে ভাবলাম, দাদা ত আজ শীগ্‌গির আসছেনা, কোথায় আছে নিমন্ত্রণ,—একটু মজা করলে হয় না একে নিয়ে! বললাম,—আপনি এলেন, কত সৌভাগ্য আমাদের! আপনি বস্থন, আমি চা করে নিয়ে আসছি।

চা করতে রান্নাঘরে এসে বৌদিতে আমাতে হেসে হেসে অস্থির! শেষকালে মুখে আঁচল গুঁজতে হল, কী জানি, লোকটা যদি শুনতে পায়! বৌদিকে বললাম, একা একা বসে আছে, কী মনে করবে? তুমি যাও আমি চা করছি।—আহা, ন্যাকা! নিজেই যা'না, ভয় করছে নাকি?

বাধ্য হয়ে নিজেকেই যেতে হ'ল। যাবার আগে একটা

কাজ করলাম। একটু আগেই গা ধুয়েছিলাম, পরণের সাড়ীটা বদলে নিলাম, আর কপালে পরলাম একটা কালো টিপ। ঘরে ঢুকে দেখি, টেবিল থেকে কী একটা পত্রিকা টেনে নিয়ে ভদ্রলোক পাতা ওল্‌টাচ্ছে। আমাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, বললে,—বসুন ?

কিন্তু বসলাম না। যাই বল ভাই, ব্যাটাছেলেদের চোখের সামনে বসে থাকতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। যাই হোক্, ভদ্রলোক আর অনুরোধ করলেন না, পত্রিকার পাতা যেমন ওল্‌টাচ্ছিলেন তেমনি ওল্‌টাতে লাগলেন। দেখলাম, লোকটির একটু লাজুক লাজুক ভাব। তবে কী জানিস ভাই, ওটা ওদের যাকে বলে—পোজ'—মেয়েদের সামনে ওরা ভাল মানুষটি সেজে থাকে, ঐতেই বুঝি গলে জল হয়ে যাব আমরা! একটু হেসে বললাম,—এইখানে কী আপনি একাই এসেছেন ?

—না।

—কে কে আছেন আপনার বাড়ীতে ?

—মা।

—ও।

—আত্মীয়-স্বজন অনেকে আছেন, তবে তাদের সঙ্গে আমার ঠিক খাপ খায় না।

ভাই কণাদি, তোকে ত বলেছি, আমি আজ একটু অভিনয় করব। তাই কণ্ঠস্বর একেবারে যাকে বলে সুধামিশ্রিত করে

বললাম,—বলুন না, বিশ্বনাথদা, আপনার সব কথা শুনতে আমার এত ইচ্ছে করে!

এই কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর চোখমুখ হয়ে গেল উজ্জ্বল, বললে,—বাঃ। আপনার মুখে 'দাদা'-সম্বোধন ভারী সুন্দর শোনালো ত! যাক্, আজ থেকে দাদার অধিকার পাওয়া গেল।

হাসলাম শুধু, কিছু বললাম না।

...কিছুক্ষণ চেয়ে কী যেন দেখছে! ঐ এক ধরণের ছেলে! দেখে মনে হয় কত গম্ভীর, কত উদাস, কত নিস্পৃহ! কিন্তু একমাত্র যারা ওদের চেনে, তারাই বলবে, ওটা ওদের মস্ত বড় একটা পোজ? অর্থাৎ মেয়েদের মনে দাগ ফেলবার উদ্দেশ্যে এটা একটা অত্যন্ত ধারালো তীর নিক্ষেপ বলা যায়। যাই হোক্, অভিনয় করতে যখন যখন নেমেছি, তখন এগুলি উপেক্ষা করলে চলবে না, বললাম,—দেখছেন কী একমনে?

—আকাশ। রঙের ওপর রঙ্ তুলে কে যেন সলজ্জ হাসির রেখা এঁকেছে,—দেখেছেন?

—আকাশই খালি চোখে পড়ে?

—না আকাশের ছায়া দেখছি মাটির ওপরে। আর দেখতে পাচ্ছি আপনাকে, গোধূলির আগুন আপনারও মুখে শিখা জ্বালিয়েছে!

কী ভাই কণাদি, আরও কিছু শুনতে চাস্? এর পরে দিন কয়েক আমি একেবারে গা-ঢাকা দিলুম। আর বলব কী

ভাই, ভদ্রলোকের সে যা অবস্থা! দাদার সঙ্গে ঘরে এসে বসে, কিন্তু চোখ দুটি সর্বদাই খুঁজে বেড়াচ্ছে! আমি আর বৌদি দরজার আড়াল থেকে মুখে আঁচল গুঁজে হেসে হেসে গড়িয়ে যাই আর কি!

না ভাই, ছেলেটির বাহাদুরী আছে।

ক্রমে ক্রমে আমার মনে একটা ভয় ঢুকল। যে-রকম ছেলে, যদি সরাসরি দাদার কাছে বিয়ের কথা বলে বসে! ভাই, দিনকতক ভয়ানক ভাবনায় পড়েছিলাম। দাদা—বৌদিরও ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল। মুখে ঐ সব বলে ভেতরে ভেতরে বিয়ের ষড়যন্ত্রই হচ্ছে কিনা কে জানে! মোট কথা, এমন অবস্থাই লোকটা করে ফেলেছে, যাতে করে বিয়ের কথা তুললে, দাদা-বৌদি যে বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, —এমন ত বোধ হয় না! তাই মনে মনে ঠিক করলাম—যথেষ্ট হয়েছে, আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, একটু শক্ত হতে হবে।

শক্ত হলাম ঠিকই, কিন্তু ঘটনাচক্রে এমনই শক্ত হতে হল যে, এখন ভেবে ভেবে একটু কেমন-কেমন ঠেকছে, ভাবছি, অতটা না করলেই হতো। কিন্তু কী করব বল, লোকটা যে অত দুঃসাহসী হয়ে উঠবে, তা কে জানত?

সেদিন সন্ধ্যা হয়েছে সবে। বাড়ীতে আমি একেবারে একা। দাদা-বৌদি দুজনেই গেছে রাত মোহানায় বেড়াতে। ও এলো। আমি আর কী করি, ভদ্রতা বলে একটা জিনিষ আছে ত? বসতে বললাম। কিন্তু সেটাকেই যে ও প্রশ্রয়ের

ইঙ্গিত বলে ধরে নেবে, কে জানত ? কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে গল্প করছিলাম। কিন্তু তাই কী অত সাহসী হয়ে উঠবার কারণ ঘটল ? সাধারণ ভদ্রতা হিসাবেই কথা কইছিলাম ভাই, নইলে আমার অত দায় পড়েনি—যা তা লোকের সঙ্গে বাজে সময় কাটানোর।

কিছু মনে করিস না, একটা ব্যাপারে লোকটার উপর আমার একটু শ্রদ্ধা জেগেছিল। দেখেছিলাম, লোকটি একটু চাপা। সাধারণত এধরণের ছেলেরা চাপা হয় না, তারা বরঞ্চ আরও বেশী করে নিজেকে প্রচার করে যাই হোক্ আগের কথায় ফিরে আসি,—গল্প ত করছিলাম। কথার পর কথায় হঠাৎ কখন বলে ফেলেছি,—আচ্ছা বিশ্বনাথ-দা আপনি কী রকম মেয়ে সব থেকে বেশী পছন্দ করেন ?

—সত্যি বলব ?

—বলুন !

—ঠিক তোমার মত। এমনি হাসি-উজ্জ্বল সোনার মত মেয়ে ! আর তারপরেই শুনলাম সেই দুঃসাহসিক কণ্ঠস্বর,—তোমার মধ্যে যেন আর একজন কাকে আমি দেখতে পাই ! সেই জন্যই ত ভালবাসি তোমাকে !—

এতটা চমকে গিয়েছিলাম যে বলার নয়, হঠাৎ দেখি একখানা হাত রয়েছে ওর হাতের মুঠোয়। হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর কী করলাম, সে তোর শুনে কাজ নেই। হ্যাঁ, যা ভাবছিস ঠিক তাই ; সোজা অপমান

করে তাড়িয়ে দিলাম। কী করব ভাই বল, দোষ কী কেবল আমারই? হয়ত একটু প্রশ্রয় দিয়েছি, কিন্তু সেটাকেই ওরা অত বড়ো করে ধরে নেয় কেন? এর পর আর ঘটনা নেই। পরশুদিন ভদ্রলোক নাকি চলে গেছে।

আর কী লিখব? অল্প কথায় লিখব ভেবেও চিঠিটা শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে গেল। ভাই অনুদি, আমিও ভাবছি আমার ভাগ্যের কথা। যতগুলি ছেলে এলো আমার জীবনে, সবগুলিই বাজেমার্কা। এমন একটিও কী আসতে নেই, যাকে অন্তরের সমস্ত কিছু শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা—উজার করে ঢেলে দিয়েও মন তৃপ্তি পাবে না, আরও কিছু দিতে ইচ্ছা করবে?

থাক্ এই পর্যন্ত আজ। ভালবাসা নিস্। বরের কথা এবার লিখিস্। শীগ্গির শীগ্গির উত্তর দিস, না দিস ত মাথা খাবি। ইতি—

অপর্ণা

... ...

দিনপঞ্জী যথাসময়ে চুরি গেল রবিবারে। ফিরেই পেলাম ওটা সোমবার। লিখেছে,—হাসব কী কাঁদব বুঝতে পারছি না! ওই নাকি আমাদের মনের কথা? এসবের মানে কী? লিখ্লাম,—নিয়ে যেও কাল দিনপঞ্জী। 'কণা' মেয়েটি তা'তে তোমায় একটি চিঠি লিখেছে, দেখতে পাবে। কল্পনায়িত কণার চিঠি হলো এই,—ভাই পর্ণা তোর চিঠির উত্তর দিতে কিছু দেরী

হলো। মনে কিছু করিও না। বার বার তোর চিঠিটা পড়েছি আর মনে হয়েছে, একী অশ্রুতপূর্ব কাহিনী শুনছি!

বিয়ের আগে আজকাল মেয়েদের জীবনে অল্প-বিস্তর এসব ঘটে, যদিও সুদীর্ঘ জীবনের পথচলার তার মূল্য সাধারণত খুবই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এই সব ঘটনার মধ্য থেকে একটি ঘটনা এমনি অত্যাশ্চর্য হয়ে থাকে, যা চির জীবনের জন্য স্মরণীয়। এই রকমই একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা আজ তোকে শোনাতে ইচ্ছা করছে, যা আমার জীবনের আকাশে সূর্যের মত ভাস্বর—দেদীপ্যমান। কী বলব ভাই, পাছে তোরা ভুল বুঝিস্, সেইজন্য তুই যখন কাছে ছিলি, তখন তোকে বলিনি, তখনো চোরের মত লুকিয়ে রেখেছি আমার সেই অমূল্য সম্পদকে।

তোর চিঠি পড়তে পড়তে আমার সেই স্মৃতি উদ্বেল হয়ে উঠছে। তুই কী পেয়েছিস, আর আমি কী পেয়েছিলাম, একবার তুলনা করে দেখ। ওঁর আজ নাইট ডিউটি, সুতরাং ঘরে আমি একা। এখন রাত অনেক, চারিদিক নিঃঝুম। আমার বরের কথা শুনতে চেয়েছিলি, সে আজ থাক্—আজ শোন—এই আমার কাহিনী। ঘুম আসছে, কিন্তু না, আজ এই চিঠির কয়েকটি পংক্তির মধ্যে তাঁকে এঁকে রাখতে চেষ্টা করব।

তাঁকে সম্বোধন করি আমি 'দাদা' বলে। হ্যাঁ তিনি আমার দাদা—আমার গুরু—আমার পূজনীয়। আমি এখন তাঁর বোন, তাঁর শিষ্যা!

তুই তখন এখানে, কিন্তু তাঁকে ত তুই চিনতিস না, দেখিসও-নি কোনদিন আর আমিও তাঁকে লুকিয়ে চলতাম তোদের কাছ থেকে, পাছে তোরা কেড়ে নিস্।

আমাদের সংসার তুই তো জানতিস্। আমরা ছিলাম মাত্র দুটি প্রাণী,—আমি আর বাবা। বাবা ভয়ানক ভালবাসতেন তাঁকে। এ বাড়ীতে তাঁরও ছিল অবারিত দ্বার।

তিনি যে কোথায় থাকতেন—কী করতেন জানি না, কোনদিন জানতেও দেন নি। কখন যে আসতেন—কখন যে যেতেন তারও কোন ঠিক ছিল না,—ভয়ানক খেয়ালী। বেশীর ভাগ আসতেন রাত্রের দিকে, তাই তোরা কাছে থেকেও কোনদিন টের পান নি। মাঝে মাঝে আমাকে অন্যমনস্ক দেখলে তোরা ঠাট্টা করতিস, এখন তার কারণটি বুঝে নে। আমি যে কবে কেমন ভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম, স্পষ্ট মনে নেই। কিছু মনে করতে গেলেই অনেকগুলি ঘটনা ভীড় আসে। তাঁকে যে পাবো না, এ জানতাম মনে মনে। কিন্তু জেনেও ধীরে ধীরে কাঙালের মতো সেই আমার রাজরাজ্যেশ্বরের কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়েছিলাম একদিন।

বহুদিন পরে এক রাত্রে তিনি এলেন। হাতে তাঁর ছিল একটা ফাইল, সেটা যখনই আসতেন তখনই তাঁর হাতে দেখেছি। ওর মধ্যে থাকত পেন্সিলে আঁকা কতকগুলি অসমাপ্ত ছবি। বলতে ভুলেগেছি ভাই পর্ণা,—তিনি চমৎকার ছবি আঁকতে পারতেন। ফাইলটা দিয়ে আমার মৃদু আঘাত করে বললেন,

নে ধর। আর কী কী রান্না করেছিস বের কর, পেটে আগুন জ্বলছে।

তিনি যেদিন আসেন, বাড়ীতে একটা উৎসবের ঘটা পড়ে যেত। ওপর থেকে বাবা নেমে আসেন, তাঁর যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য বাবা নিজে থেকে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন। আর আমি? আমার সেদিনটা এত অপূর্ব বলে মনে হয় যে, তোকে কী বলব! খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পর ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, কণা তোর সঙ্গে আজ আমার ভীষণ দরকার। ফ্লাশ-লাইটের সামনে ঘাটের ওপর বোস ত।

—ওমা কেন!

—একটা ছবি আঁকবার দরকার আছে।

তোরা হলে কী করতিস জানি না, কিন্তু আমি তো ওঁকে চিনি, তাই সেই অত রাত্রে একা ঘরের ভিতর আমি একটুও সঙ্কুচিত হলাম না। ঠিক গিয়ে বসলাম। উনি বলতে লাগলেন, —আজ রাস্তায় একটি চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়েছে, তাই থেকে এ-জিনিস আঁকবার আইডিয়া পেয়েছি। একটি ভিখারী মেয়ে আর তার শিশু।

—মাগো, শেষ কালে আমাকেই সেই ভিখারিণী করবে নাকি?

—ভিখারিণী ত আঁকতে আমি চাইনি, আমি আঁকতে চেয়েছি—মা! নে, আর দেরী করিস না, ভালো করে বোস।

ভেবে দেখ্ পর্ণা আমার অবস্থাটা। এমন পরিস্থিতিতে কোনদিন কী পড়েছিস তোরা ?

বললাম,—এই ত বসেছি।

—ও'রকম করে নয়। মা যেমন বসে ছেলে কোলে নিয়ে।

কী ক'রে ওঁকে বোঝাই, ও' আমাকে দিয়ে হবে না। আমি কী মা হ'য়েছি কোনদিন ?

কুমারী মেয়েকে উনি মা সাজাবেন! ওসব ভোলা মহেশ্বর জগতে দু'টি নেই।

—হ্যাঁ, এইবার অনেকটা হ'য়েছে। ঘাড়টা আর একটু কাৎ কর্। আঃ! চোখ ওদিকে কেন ? দাঁড়া, ঘোমটাটা টেনে দিই।

আমার লজ্জা বুঝ্বেন না, ওঁর মতো ক'রে উনি জোর ক'রে সাজিয়ে নেবেনই! কাছে এসে ধমক-টমক দিয়ে ঠিক ঠিক আঁচলটা তুলে দিলেন মাথায়। এমন লজ্জা করছিল! তবুও মুখ ফেরাবার জো নেই,—প্রচণ্ড ধমক খেতে হবে।

—বাঃ! চমৎকার দেখাচ্ছে ত তোকে! আঃ! মুখ নামাস্ নি—মুখ নামাস্ নি।

সামনে একটা চেয়ার আর ছোট্ট একটা টিপয় টেনে নিয়ে বসলেন। খুললেন ফাইলটা।

—বেশীক্ষণ বসতে হবে না, পেন্সিল-স্কেচ্টা ক'রেই ছেড়ে দেবো।

এর পরে কয়েক মিনিট একবার আমার দিকে, আরেকবার

খাতার দিকে,—এইভাবে কেটে গেল কিছুক্ষণ। হঠাৎ কী ভেবে এক সময় মুখ তুলে দেখি, দরজার গোড়ায় বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছেন। আর যাবে কোথায়! সমস্ত ফেলে-ছড়িয়ে বিছানার মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেললাম!

—আহা-হা, একী হ'লো। আর একটুখানি ছিল যে!

বাবা সহাস্যে ব'লে উঠ্‌লেন,—ওরে কণা, তোর আর লজ্জা করতে হবে না,—এই আমি চ'লে যাচ্ছি।

—বলুন ত মেসোমশায়, বলুন ত!

—ও' একটা পাগলী। তা' তুমি এঁকে যাও, আমি গেলেই ও' ঠিক হ'য়ে যাবে!

বাবা চ'লে গেলেন। ওপরের সিঁড়িতে তাঁর খড়মের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। উনি এতক্ষণে কাছে এসে ভয়ানক সাধাসাধি আরম্ভ ক'রেছেন।

—আর একটুখানি, কাঁটায় কাঁটায় মাত্র একমিনিট।

কিন্তু আমায় ওঠায় কার সাধ্য? বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পড়ে টের পেলাম, হাল ছেড়ে দিয়ে শেষকালে খাতাপত্র গুছিয়ে রাখছেন! কয়েকটি মুহূর্ত বেশ কেটে গেল। একসময় কাছে এলেন, বললেন,—ওরে কণা, এবার ওঠ্, নিজের বিছানায় যা, আমি শোবো, ভীষণ ঘুম পেয়েছে।

—উঠব না।

—লক্ষ্মীটি! এই দেখ্, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

—তার আমি জানি কী!

—আচ্ছা বেশ, না-ই উঠ্‌লি, দেখ্‌ আমি শুতে পারি কি না।

এই ব'লে একটা পাশ-বালিশ, আর একটা মাথার বালিশ টেনে নিয়ে তুম্‌দাম্‌ মেঝেতে ফেললেন। তার পর দরজাটা দিলেন ভেজিয়ে, জানলা খোলাই ছিল, আলো দিলেন নিভিয়ে, জ্যোৎস্না এসে সমস্ত ঘর ভরে ফেলল। তারপর ভাই অবাক কাণ্ড, সেই খালি মেঝের ওপরে বালিশ জড়িয়ে দেখতে দেখতে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষকালে আমিই অপ্রস্তুত! কিন্তু এমন ঘোরতর লজ্জায় পড়েছিলাম যে, তা কাটিয়ে উঠতেই বেশ খানিকটা সময় পার হয়ে গেল। কিন্তু তারপরে ধড়মড় করে উঠে সেই-যে পালালাম, সারাদিন আর মুখ দেখাইনি। কিন্তু এতেও কী হুঁস আছে? সারাদিন ঘর বন্ধ করে কী করলেন কে জানে, যখন বেরিয়ে এলেন তখন বেলা তিনটে! না-খাওয়া, না-স্নান, সে যা অবস্থা হয়েছিল, তা' দেখলে কান্না আসে। অথচ এমন মানুষ, দরজায় ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়েছি, একটুও চৈতন্য নেই। হাতে দিলেন একটা কাগজ, বললেন,—তোকে দিলাম। আর আমি স্নান করতে যাচ্ছি, যাহোক্‌ কিছু খেতে দে, পেট জ্বলছে!

দেখলাম ছবিখানা। সে যে কী অপরূপ তা' না দেখলে বোঝানো যায় না। একটি চমৎকার ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়ে আমি বসে আছি, আমার দৃষ্টি—আমার মুখশ্রী এত

কমনীয়,—এত মাধুর্যমণ্ডিত করে তুললে কে? যেন চমৎকার একটা সুরের ঝংকার হয়ে বাজতে লাগলাম সারাদিন—আমি মা—আমি মা!......আর কী শুনতে চাস পর্ণা? একটা দিনের কথা। এই দিনটা আমার জীবনের পৃষ্ঠায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কোথা থেকে উনি এলেন। বললেন —ভূল পথ ধরেছিলামরে! বাহ্যিক রূপটার মূল্য আর্টের কাছে কতটুকু? সত্যকার রূপ রয়েছে অন্তরে, যেখান থেকে নিয়ত তার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

—কী হল দাদা?

—কী তফাৎ রইল ফটোগ্রাফীর সঙ্গে আর্টের তাহলে? জড়জগতের ছবি এঁকে চলেছি, কিন্তু মূল্য তার কতটুকু? দেখে এলাম কলার্ত ফটোগ্রাফীর নিদর্শন,—এই শ্রেণীর রূপচর্চার সঙ্গে কোথায় তার তফাৎ?

—আগে বিশ্রাম নেও দেখি, পরে বক্তৃতা হবে'খন।

—এই যে সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে রয়েছিস, এইটাই কী তোর ছবি? তা'নয়। ঐ যে তোর চোখে জ্যোতি, সমস্ত মুখ ভরে কেমন একটা বিভা,—এর সত্য আরও গভীর। এগুলি কী ধরতে পারবে ফটোগ্রাফী? না একমাত্র আর্টিস্টই বলতে পারবে—তোমার মধ্যে দেখ্‌ছি আমার সেই পরমাশ্চর্যকে! তোমার লীলায়—তোমার ভঙ্গীমায় দেখ্‌ছি সেই পরম রূপকারেরই প্রকাশ!

—এখন এসব রেখে খাবে এসো। কিন্তু খেতে বসেও কী

নিস্তার আছে ? কী যে হয়েছে ওঁর, মুখে যেন খই ফুটে চলেছে সর্বক্ষণ ! শেষকালে খাওয়ার পর বল্লেন নাঃ, আর বক-বকানি ভালো লাগছে না। বারান্দায় ইজিচেয়ারটা আছে না ? ওখানে শুয়েই আজ রাত কাটাবো। একটা চাদর দিস্ ত, গায়ে দেবার।

কোনও প্রতিবাদ খাটে না ওঁর কাছে, সে কথা ভালভাবেই জানি, সুতরাং নিশ্চুপে ওঁর নির্দেশ পালন করে চল্লাম।

অনেক রাত ! বিছানায় ছটফট্ কর্ছি, ঘুম আস্ছে না। এক সময় উঠে গেলাম বারান্দায়। শুয়ে আছেন, ম্লান জ্যোৎস্না ওঁর চারিদিকে যেন একটা স্বপ্নের জাল বুনে রেখেছে ! খুব কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

বললাম—ঘুমিয়েছ ?

—না ! কিন্তু তুই যে উঠে এলি বড় ?

—বেশ করেছি উঠে এসেছি, তোমার তা'তে কী ?

আমার মাথায় হাতখানা রাখলেন, বললেন,—তোর কী হয়েছেরে কণা ?

—কী হয়েছে সে কী তুমি বুঝবে ? পাষাণেরও হৃদয় আছে, তোমার তা-ও নেই।

—বলছিস কী ?

—তুমি নিষ্ঠুর তাই কিছু বোঝনা।

না পর্ণা, আজ আর কোন দ্বিধা নয়, সব তোকে জানাব। আমি আর পারলাম না বেঁধে রাখতে নিজেকে। ওঁর ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে হু-হু ক'রে কেঁদে ফেললাম,—নিষ্ঠুর তুমি—নিষ্ঠুর !

ধীরে অতি ধীরে তিনি বলতে লাগ্‌লেন,—না কণা নিষ্ঠুর আমি নই, আমারও প্রাণ আছে। যে-দান তোর কাছে পাচ্ছি তা' আমাকে ঋণী করে রাখছে। তুই কী বুঝিস না, এতলোক থাকতে কেন শুধু তোর কাছেই ছুটে আসি !······নে ওঠ্‌ ছেলেমানুষী করিস্‌ না,—কী করবি আমাকে নিয়ে কণা, দুনিয়ায় ভবঘুরে পাগলা লোক আমি !

কাঁদতে লাগ্‌লাম। তিনি আমাকে সস্নেহে ধীরে ধীরে উঠিয়ে দিলেন, তারপরে হাত ধরে নিজে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে এলেন আমাকে, কেবল বল্‌লেন,—লক্ষ্মীটি বোন, অমন করছিস্‌ কেন, কাঁদবার কী হয়েছে ?

আজ ভাবি তিনি কত মহৎ ! এমন কী ভাগ্য করেছি যে তাঁকে পাবো। না, না তাঁকে তো পেয়েছি, তিনি আমার দাদা —আমার পরম সুহৃদ ! তারপরের দিন থেকে বাবার সঙ্গে কী সব পরামর্শ হ'তে লাগল। মাসখানেকের মধ্যেই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, হাতে শাঁখা সিঁথিতে সিঁদুর, স্বামীর ঘর কর্‌তে চলেছি।

স্বামী আমার দাদারই বন্ধু। আমার বিয়েতে দাদা যে কী অমানুষিক খেটেছেন, তা বলার নয়। অনবরত কাজ করে চ'লেছেন,—মাঝে মাঝে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছেন,—লক্ষ্মী বোন্‌—সোণার বোন্‌—কষ্ট হচ্ছে ?

শ্বশুর বাড়ী গিয়ে দেখি—সেখানেও তিনি। হাসিমুখে খেটে চলেছেন। অষ্টমঙ্গলার দিন সন্ধ্যার পর আমি ছাদের আল্‌সের ওপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ধীর পায়ে দাদা কাছে এলেন।

—কণা—বোন ?

—পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর্‌লাম ! তিনি অতি স্নেহে তুলে ধর্‌লেন আমাকে। ভাই পর্ণা, কী বল্‌ব, আমি আর লিখতে পারছিনা, পরিষ্কার দেখলাম তাঁর চোখে জল !—

—তুই যে আমার কতখানি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিস্ তা' ত জানিস না বোন। মাঝে মাঝে দাদাকে মনে করিস্।—

—দাদা ?

—যার হাতে তোকে তুলে দিয়েছি, আশা করি সে তোকে সুখী করতে পারবে। তুই সুখী হ' বোন্, এইটুকুই প্রার্থনা।

ভাই পর্ণা, এইখানেই শেষ করতে ইচ্ছা কর্‌ছে। কিন্তু না, আরও একটু আছে। বহুদিন পরে এই সেদিন তিনি আবার একবার এসেছিলেন। সেই বিদায় বেলায় সেরকম বিমর্ষ দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি বিমর্ষ। অনেক কথাই হল। এক সময় বল্‌লেন,—ঋণ শোধ করে এলাম মনে হচ্ছে। এবার আমি মুক্ত। দেখ্ কণা, একথা নিদারুণ সত্য, জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না। আমার সমস্ত ব্যাকুলতা আর উজ্জ্বলতা তিনি নিজের বলে টেনে নিয়েছেন। এতদিন রূপের মধ্যেই

তাঁকে দেখেছি, এবার সব কিছু পার হয়ে অতি কাছে থেকেই তাঁকে দেখ্‌তে পাবো বোধ হয়।

চলে গেলেন। আমি নীরবে তাঁকে পাঁয়ে প্রণাম জানাতে পেরেছিলাম শুধু—আর কিছু নয়।

ভাই পর্ণা, আজকের মত এইখানেই শেষ। প্রীতি গ্রহণ করিস্।

ইতি—কণাদি।

... ...

দিনপঞ্জীর খাতা যথারীতি চুরি গেল, ফেরৎ-ও এলো পরের দিন। কিন্তু 'লিপি' নেই। ব্যাপার কী? রাগ করল নাকি?

ইতিমধ্যে বন্ধুদের টানাটানিতে মেতে গেলাম একটা কাজে। বন্ধুদের ক্লাবে বহুদিন থেকে একটা পুরানোধরণের নাটকের মহলা চলছিল, তাতে মাঝে মাঝে যোগ দিতে হ'তো আমাকেও। হঠাৎ শুনি আমাদের ক্লাবের অন্যতম পাণ্ডা কেষ্টবাবুর উৎসাহে নাটকটি মঞ্চস্থ হ'তে চলেছে।

কিন্তু খরচের টাকা উঠ্‌ল কোথা থেকে? কুড়ি পঁচিশ জন সভ্যের মাসিক আট আনা চাঁদা থেকে নিশ্চয়ই নয়!

কেষ্টবাবুর বাহাদুরী আছে। আমাদের পাড়ার প্রাচীন ব্যক্তি বিজনবাবুর ছিল ফুলের ব্যবসা,—'বিজন নার্সারী'। চারিদিকে বিরাট ফুলের বাগান—মাঝখানে ছোট্ট একটা বাংলো—একটা বাঁধানো ঝিল একদিকে শোভা পাচ্ছে। সত্তর-উত্তীর্ণ বিজনবাবু একা থাকেন, একাই করেন কাজকর্ম, সাঁওতাল কুলি-

কামীনদের খাটান দিনের বেলায়,—দুটি চাকর আছে, হারু আর বিপিন,—ফুলের কাজে, ফুল চেনায়, তোড়া বাঁধায়, বীজ রাখায়,—বিজনবাবুর নিজের হাতে তৈরী দুই বিশ্বস্ত 'মালী'।··· এই বিজনবাবুই শেষ পর্যন্ত হ'লেন আমাদের নাট্য-প্রচেষ্টার কর্ণধার। নির্জন বিজনবাবু কেষ্টবাবুর চেষ্টাতেই 'সামাজিক' হ'য়ে উঠ্লেন,—দু-একটা গানের জলসাও হ'য়ে গিয়েছিল ওঁর বাড়ীতে,—গান শুনে ভালো জলখাবার খেয়ে হারু-বিপিনদের হাতে তৈরী ফুলের ছোট্ট তোড়া হাতে দুলিয়ে বাড়ী ফিরেছি কতদিন। পর্ণা গান গাইত সে জলসায়, একবার ফুলের সাজে সেজে কী-এক ধরেণের নাচ দেখিয়ে খুব নামও করেছিল। গানের ব্যাপারে পর্ণার দাদা নিজে বিশেষ উৎসাহী,—নিজেও মার্গসংগীতের চর্চা করতেন কাজকর্মের অবসরে।

বিজনবাবু ক্রমশই এতে উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্তে লাগ্লেন, আমাদের সবার সংগেই বেশ ভালরকম আলাপ হ'য়ে গিয়েছিল, কয়েকবার ক্লাবেও এলেন নাটকের মহড়ায়। শেষ-বয়সে শুধু একটা নেশা লাগল,—সেটা প্রবন্ধ রচনা করা ও সুযোগ পেলেই সবাইকে প'ড়ে শোনানো। প্রবন্ধগুলি আকারে খুব ছোট হ'তো,—আর বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়লে বোঝা যায়,—বিষয়বস্তু সব কটারই প্রায় এক। সময় চ'লে যাচ্ছে, জীবনের সায়াহ্ন সমাগত,—কতো কাজ বাকী রইল, কতো আশা সফল হ'লো না, কতো সঙ্কল্প সিদ্ধ হ'লো না,—কিন্তু এ'সবের জন্য সময় ব'সে নেই,—ঘড়ীর কাঁটা ঠিক স'রে স'রে

যাচ্ছে, পেণ্ডুলাম ঠিক দুলে-দুলে যাচ্ছে,—দেয়াল ঘড়ীতে সময় সমানেই বেজে যাচ্ছে,—স্কুলবাড়ীতে পেটা ঘড়ীটা ঠিক বাজে,—ঢং-ঢং! কারখানার বাঁশীও প্রতিদিন বেজে চলে!…ওঁর প্রবন্ধের নামগুলিই হ'তো এইরকম,—'সময়,' 'ঘড়ী' 'পেলাম' 'স্কুলের ঘণ্টা' 'কারখানার বাঁশী' 'বেলাশেষের অবসন্ন ছায়া!'…

কিন্তু, যা' বলছিলাম। বিজনবাবুর ঝিলের ধারে স্টেজ-বাঁধার হুড়োহুড়ি,—আমার একটু ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল,—স্টেজে পর্দা টানিয়ে 'সিন' আঁকছি,—বন্ধুরা মঞ্চের কাজ ক'রে মধ্যাহ্নে (সেদিন ছিল ছুটীর দিন, বেশ মনে আছে) যে-যার বাড়ীতে গেছে খেতে,—আমি 'যাই-যাই' ক'রে তখনো যাই নি। কাপড়ের ওপরে প্রথম প্রলেপ 'গ্লু'-মেশানো 'হোয়াইটিং'টা শুকিয়ে গেছে,—তার ওপরে রং চড়িয়ে বসন্তকালের পুষ্পিত বনশ্রীকে আনবার চেষ্টা করছি,—'ঘড়াঞ্চী' ছেড়ে নীচে নেমে এসে একটা নুয়ে-পড়া শাখার প্রান্তে প্রয়াস করছি ফুল-ফোটাবার,—হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি,—পর্ণা। ভয়ানক চ'ম্‌কে গেলাম, হাতের তুলিটাও গেল কেঁপে। বললুম,—তুমি!

বলল,—গিয়েছিলাম বাড়ী। মাসীমা বললেন, খাওয়া নেই দাওয়া সেই নার্সারীতে গিয়ে ছবি আঁকছে,—একবার ডেকে দিতে পার মা? তাই ডাকতে এলাম।

—সর্বনাশ, কেউ দেখে নি ত?

মুখটিপে একটু হেসে বলল,—দাদু দেখেছে।

বিজনবাবুকে আমরা সবাই ততদিনে 'দাদু' বলতে শুরু

ক'রেছি, দেখলুম, ও-ও তাই বল্‌ল।

বললাম,—দাদু কিছু বলল না ?

—কী আবার বলবে ? বল্‌লাম, দাদু, স্টেজ্ দেখতে যাচ্ছি, আসবার সময় কিছু ফুল তুলে আনব। দাদু বলল,—বেশ, যাও। এলাম। এবার উঠে বাড়ী গেলে ভাল হয়, মাসীমা ভাতের থালা নিয়ে ব'সে আছে।

তুলিগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে শুরু করলাম। বললাম,—কণার চিঠি ত পড়া হ'য়েছে, মন্তব্য কিছু ত পেলাম না !

একটু থেমে থেকে মুখটা আমার দিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল,—'কণা আর কণা' ওকে আর ভোলা যায় না দেখছি ! এতো কল্পনার ছবিও আঁকে মানুষ !

হেসে বললাম,—যাক্ বুঝেছ তাহলে।

—কণার ও'চিঠির মানে কী হ'লো ? কণার ও লোকটা কে ?

বল্‌লাম,—বাড়ী গিয়ে লিখে রাখছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে আসব। বিকেলে চুপি চুপি গিয়ে এর উত্তরটা জেনে এসো। খাতাখানা টেবিলের ওপর থাকবে।

... ...

পর্ণার জবানীতে চিঠির আকারে দিনপঞ্জীতে লিখলাম,—

ভাই কণাদি, তোর চিঠি বাস্তবিকই চমৎকার ? তোর ভাষাতেই বলি, তুই যা পেয়েছিলি, তার তুলনা মেলে না !

ও'রকম কেউ যদি আসতেন আমার জীবনে, তাহলে তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে চিরদিন পূজা করতাম!

ভাই, চুপিচুপি একটা কথা বলব? তিনি বোধহয় এখনো বিয়ে করেন নি? ছোট্ট চিঠিতে কিছু মনে করিস না, পরে বড়ো চিঠি দেবো। ভালো কথা, ওঁর নামটা কীরে? ইতি

অপর্ণা। ... ...

দিলো অপর্ণার চিঠির উত্তর কণার নিজের ভাষায়,—ভাই পর্ণা, যাঁর কথা তুই জানতে চেয়েছিস্, তাঁর নাম হচ্ছে শ্রীবিশ্বনাথ ব্যানার্জী,—নিজের অহমিকার কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিলি ব'লে যাকে অতি কাছে পেয়েও তুই নিতে পারলি না,— অবহেলায় হারালি। ইতি

কণাদি।

... ...

খাতাখানা এবারও যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছল,—উত্তরও এলো আগের চেয়ে আকারে বড়ো হ'য়ে।—রঙ ফলিয়ে গন্ধ বানাতে দেখি ওস্তাদ, এবার মাসিক পত্রিকাগুলিকে আক্রমণ শুরু করলেই ত হয়!...কিন্তু গল্পের সারটুকু কী? আসল অপর্ণাকে আসতে? উত্তর চাই কালকেই। দাদুর বাগানের স্টেজে কাল পারফরমেন্স,—সে নিয়ে যে একজন নাওয়া-খাওয়া ভুলে আছে তা জানি! মাগো, গালে রং মাখার এত সখ!

তবুও যদি সত্যিকার মেয়ে হ'তে ? সত্যি, পুরুষের মেয়ে সাজা ছু'চখে দেখতে পারি না !···নিজেরই যদি মেয়ে সাজবে, ত দাছুকে ধ'রে আর আমার দাদাকে খেপিয়ে আমাকে ফুলের সাজ পরিয়ে নাচ দেখাবার ষড়যন্ত্র কেন ? নিজেরা নাচ দেখালেই ত হয় !···যাইহোক আমার প্রশ্ন নিশ্চয়ই মনে আছে ? স্টেজেই উত্তর চাই কাল। মেয়ে সেজে কাছে দাঁড়াতে লজ্জা করবে না ত ?

অভিনয়ের আয়োজনে বিজয়-দাতুর খুব কাছে এসে পড়েছিলাম এ'কয়দিনে। আমাকে বারবার কাছে ডেকে নিয়েছেন, বলেছেন, বইটা বড়ো ভালো বই ধরেছ তোমরা। নায়িকার পার্ট করছ তুমি, একেবারে জ্বালিয়ে দেওয়া চাই!

বারে বারে আমার মুখের দিকে চেয়েছেন, কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারেন নি। সন্ধ্যার সময় একবার বললেন,— বিশ্বনাথ, কতো চেয়ার পেতেছো তোমরা, আসবে কত লোক! আমার শূন্য শ্মশানপুরী আবার জেগে উঠ্‌বে কী বলো!

গালুডি থেকে ও'র পরিচিত কয়েকজন বন্ধু সকালেই এসে আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছেন ওঁর। তাঁরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দাতু নিদারুণ উৎসাহে দেখাচ্ছেন তাঁদের বাগানের বিভিন্ন অংশ, চেনাচ্ছেন বিভিন্ন ধরণের ফুল! ওঁর কাছে ফুল ত শুধুই ফুল নয়, যেন তরুণ কবির প্রথম কবিতার ছন্দে-সাজানো মমতাময় অক্ষর পংক্তি!

সে-রাত্রে দাতুর কী হ'য়েছিল, আমি তা জানি। উনি আমাকে সব বলেছিলেন। গভীর রাত্রে অভিনয়-শেষে সবাই চ'লে গেছে, আমিও মেক্-আপ্ ভুলে সব-কিছু দেখে টেখে নিয়ে চ'লে যাব হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, পরিত্যক্ত স্টেজের ওপরে একটা চেয়ারে কেমন-যেন এলিয়ে প'ড়ে আছেন দাতু! তু'-

একবার ডাক দিয়ে সাড়া না পেয়ে ভয় হ'লো, দৌড়ে গেলাম বাংলোর দিকে, বাংলোতে হারু আর বিপিনের সাহায্যে হ্যাজাক বাতিগুলো ঠিক ক'রে রাখছিলেন কেষ্ট বাবু, তাঁকে সব বললাম। ছুটে এলাম দাদুর কাছে। অনেক ডাকাডাকিতে ওঁর সাড়া পাওয়া গেল। মনে হ'লো যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন! রাত তখন প্রায় তিনটের কাছাকাছি,—কেষ্টবাবুর বাড়ী দূরে, উনি সেই রাত্রেই হারুকে প্রহরী ক'রে চ'লে গেলেন,—আমি দাদুর কাছেই র'য়ে গেলাম বাকী রাতটুকু গল্প ক'রে কাটানোর জন্য। দাদু বিপিনকে পাঠালেন আমার বাড়ীতে মাকে পাহারা দেবার জন্য। যদিও জানতাম, তার দরকার ছিল না,—যে আজ উৎসবের প্রারম্ভে ফুলপরীর সাজে সেজে অপরূপ তনু-হিল্লোলে দৃশ্য-সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে গেল মঞ্চমায়ার আলোয় নিজেকে উদ্ভাসিত ক'রে,—পূর্ব-ব্যবস্থামতো সে-ই আজ মার কাছে শুয়ে থাকবে রাতটা,—কারণ, জানাই ছিল, খাওয়াদাওয়ার পালা শেষ ক'রে আমাদের বাড়ী ফিরতে বেশ রাত হবে।

সে'এক বিহ্বল রাত দাদুর পক্ষে! ওর ঘরে ব'সে উনি আমাকে স-ব বললেন। ষ্টেজে আমাকে দেখে, ষ্টেজের বাইরে আমাকে আর অপর্ণাকে এক সংঙ্গে দেখে ওঁর হঠাৎ কী যে হ'লো, উনি——কিন্তু সে ঘটনা ওঁর নিজের ভাষাতেই বলি।

"কী হ'লো, জানো? অভিনয় দেখে যাচ্ছি, দেখতে দেখতে মনটা কেমন উদাস হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু শেষ দৃশ্যে বৃদ্ধবেশধারী

অভিনেতাটি যখন এক বক্ষ বিদীর্ণ হাহাকারে ভেঙে পড়্লেন, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না! আমারও যে ওর মতো স-ব ছিল, আমিও যে ওর মতো স-ব হারিয়েছি! একটি-মাত্র আমার ছেলে, কানু,—সে আমার খোঁজও নেয় না, আসেও না, যখের ধন আগ্‌লে এই শ্মশানে আমি পড়ে আছি!

কিন্তু সে যাক্—তোমরা আলোগুলো নিয়ে এদিকে চ'লে এলে,—ব্যস্ত হয়ে পড়লে কাজকর্মে, আমি বাগানে তেমনি প'ড়ে রইলাম! গভীর রাত্রির বাঁকা চাঁদ উঠেছে। অতি কোমল কোনো আঙুলের একেবারে ছোঁয়ার মতো লাগ্‌ছে এই আবছা আলোছায়ার স্পর্শ! ঘুমন্ত বাগানটিও যেন এক করুণ স্বপ্নে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে বারবার! ঐ খানিকটা দূরে ঝাউয়ের সারি, এ'পাশে টিকোমার অবারিত দাক্ষিণ্য, ওপাশে গোলাপ, আরও কিছু দূরে কিছু গাঁদা, কিছু সুইট্-পী, হলিহক আর চন্দ্র মল্লিকা! ঝিলটা যেন ঝিমিয়ে আছে বাঁকা চাঁদ বুকে নিয়ে, একটুও ঢেউ নেই,—নিথর, নিশ্চল!

নিজের দিকে তাকালাম। ঘাড়টা অনেকদিন থেকেই নুয়ে প'ড়েছে, জোরে চলতে পারি না, কষ্ট হয়। চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে গেছে। সমগ্র শরীরে মনে মহাকালের পদচিহ্ন!

বুঝ্‌লে বিশ্বনাথ, এই আমি যখন যুবক ছিলাম, বাগানের রূপ তখন ভিন্ন ছিল। সে আমার প্রথম প্রেম,—মাটিকে ভালবেসেছিলাম : দেশ-বিদেশ থেকে আনাতাম বীজ, আমার এই কয়েক-বিঘা-মাটির পৃথিবী তখন হেসে উঠ্‌ত! এধারে

ফুল, ওধারে ফুল,—ফুলে আর ফুলে হাসির সমুদ্র ঢেউ খেলে যেতো!

কিন্তু থাক্, সে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় আর হাত দিয়ে লাভ নেই। সরে গেলাম। সামনে চেয়ারগুলো এলোমেলো প'ড়ে আছে,—পার হ'য়েই তোমাদের একরাত্রির রঙ্গমঞ্চ! তখনও দেখি ঝুলে আছে যবনিকা। তারও অন্তরালে অনেক-কিছু। কোথাও বিরাট রাজপ্রাসাদ, কোথাও যুদ্ধ-শিবির, কোথাও মাঠ, কোনো নির্জন বনভূমি, কোথাও বা অগ্নিদগ্ধ গ্রাম্যকুটীর। এগিয়ে গেলাম। সেই নিস্তব্ধ প্রাসাদ, বিপুল অরণ্যানী,—তার মাঝে একটি-মাত্র অভিনেতা আমি,—নীরব নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

এরপরের কথা বিশ্বনাথ, ঠিক বোঝাতে পারব না। কী রকম যেন হ'য়ে গেল! মনে হ'লো, অনেক পায়ের শব্দ শুনছি, অনেক কথা অনেক কথা অনেক কাকলী! মরুভূমি যেন শস্যশ্যামল হ'য়ে উঠেছে...

—যাই বলুন, আপনার বাগানটা কিন্তু সত্যিই চমৎকার!

একটু ম্লান আর মৃদু হেসে বল্‌লাম,—ভালো লাগল আপনার?

মিসেস্ মুখার্জী অপরূপ ভঙ্গিমায় একটু হেলে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বল্‌লেন,—নিশ্চয়!

কে যেন এই সময় দ্রুত এগিয়ে এলেন আমার কাছে।—এই যে বিজনবাবু, আপনাকে মশাই খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।

গেছলেন কোথায়? আপনি হলেন গৃহস্বামী, আপনি কিনা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আসুন-আসুন, আলাপ করিয়ে দেই।

আমার গালুডির বন্ধু ক'লকাতা হাইকোর্টের নাম করা ব্যারিষ্টার মুখার্জী সাহেব আমাকে নিয়ে চললেন দর্শকমণ্ডলীর পুরোভাগে।

—এই যে ইনি। ইনিই বিজনবাবু, আমাদের সত্তর বছরের তরুণ বন্ধু। আর ইনি আমার বন্ধু, বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চ'মকে তাকালাম। এ আমার সৌভাগ্যেরও অতীত! কী যে করব ভেবেও পাচ্ছি না! ভারী স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ কান্তি! গায়ে হাফসার্টের ওপর একটা চৌকো-চৌকো-চেক্-দেওয়া প্যাটার্ণের চাদর এলোমেলো ক'রে ফেলে রাখা,—পায়ে ধূলোয় লাল-হ'য়ে যাওয়া ক্যাম্বিসের জুতো জোড়া ছাড়িয়েও ধূলো উঠেছে হাটুর বোধ হয় কাছাকাছি,—হাতে একটা সরু কঞ্চি,— যেন এক চিরবৈরাগী পথচলা-পথিককে সভার সমারোহের মধ্যে জোর ক'রে টেনে আনা হ'য়েছে! আমার ঠিক সেই মুহূর্তে কী মনে পড়েছিল জানো বিশ্বনাথ? 'পথের পাঁচালী'— 'অপরাজিত'র সেই অপু আর অপর্ণার খুলনার ঘাটের ক্ষণিকের ঘরকন্না, তারপরে গ্রামে অপর্ণার সেই বধূ জীবন, শনিবারের ছুটীতে বাড়ী এসে চুপি চুপি পিছনে থেকে অপর্ণার দুটি চোখ-টিপে ধ'রে ভয় দেখানো!

ফুল দিতে গেলাম, বললেন,—থাক্-থাক্, ছিঁড়বেন না,—

আমি আসব, আপনার ফুলের রাজ্যে মাঝে মাঝে এসে ব'সে যাব, ঈস! কতো ফুল আপনার!

দুটি খুসী-হওয়া অপরূপ শিশু-চোখ, যা' যখন দেখছে, তাতেই মুগ্ধ হ'চ্ছে!...

মুখার্জী-সাহেব নাড়া দিলেন,—এদিকে একবার আসুন ত?

বিভূতিবাবুকে তোমাদের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আমি স'রে গেলাম বললাম,—কী?

ফিস্‌ফিসিয়ে মুখার্জী-সাহেব বললেন,—সিগারেট্ অফার করলেন, উনিও নিলেন। কিন্তু আপনার নিজস্ব তামাকের ব্যবস্থাও ত আছে? ওঁকে দিন,—খুব খুশী হবেন! তামাক খেতে ভীষণ ভালবাসেন! একেবারে সেই বাঙ্‌লার দোয়েল-ডাকা পল্লী নিশ্চিন্দিপুরের লোক!

ভারী ভালো লাগ্‌ল এ'কথা শুনে, হারু আর বিপিনকে ডাক্‌তে ডাকতে ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে গেলাম।—ওরে ও বিপিন, ও হারু?

সাড়া দিল না। কিম্বা, আমারই কণ্ঠস্বর জনতার জটলা ভেদ ক'রে উচ্চে উঠ্‌তে পারল না বোধ হয়। খানিকটা এগিয়েছি, হঠাৎ দুই চোখ ঝল্‌সে দিয়ে দুটো তীব্র আলো দেখা দিল। সইতে পারলাম না, খানিক চোখ বুজিয়ে রেখে তারপরে প্রশ্ন করলাম,—কে?

—দাদু, আমি।

—কে, কেষ্ট?

—হ্যাঁ, দাদু, আরও দুটো হ্যাজাক নিয়ে এলাম। কোথাও মেলে নি, অতি কষ্টে রামু লালার কাছ থেকে যোগাড় ক'রে আনলাম।

—বেশ ভাই বেশ! তোমরা না হ'লে কিছুই হ'তো না এ'সব। তা' এখন ত নাচগান, থিয়েটার আরম্ভ হ'তে দেরী কতো?

—তা' ঘণ্টাখানেক!

কেষ্ট চ'লে গেল। আবার অন্ধকার। ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছটার নীচ দিয়ে চ'লেছি, হঠাৎ পায়ে কী একটা নরম ঠেক্‌তেই থমকে দাঁড়ালাম।

—আঃ! কে?

অতি ধীরকণ্ঠেই উত্তর দিলাম,—আমি।

আমার পায়ের কাছে একজন-কেউ ব'সেছিল বলে মনে হ'লো, এবার উঠে দাঁড়ালো—বলল,—কে, দাদু?

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কে?

ভয়ানক চমকে উঠেছিলাম ভাই বিশ্বনাথ। কেন এ'চমক্, তা' তোমাকে পরে বল্‌ছি।

—আমি কে?—হেসে উঠ্‌ল, তারপরে বলল,—আলোয় আসুন ত?

হাত ধ'রে নিয়ে গেল ঘরের কাছে আলোর নীচে, বলল,—এইবার দেখুন ত?

ভালো করে দেখে হেসে উঠ্‌লাম,—ও' তুমি, অপর্ণা?

বেশ মানিয়েছে ত ফুলের সাজে! ওকে এই কথা জিজ্ঞাসা করছি, আর ভিতরটা ধক্ ধক্ ক'রে উঠ্ছে! কার কথা আচম্‌কা মনে পড়্ল জানো? আমার ছেলে, কানু? তার মায়ের কথা! বহুদিন হ'লো স্বর্গে গেছে! কিন্তু, সে-ও যে এমনি ফুলের সাজে—

যাক্ গে কথা পরেই বল্‌ব। ওকে বললাম,—তোমার ত আজ প্রথমেই নাচ দেখবার কথা, তাই না অপর্ণা?

বেশ হাসিখুশী প্রাণচঞ্চল মেয়েটী। বলল,—ঈস্, নাচ দেখাবে না আরও-কিছু! আমি সেজেগুজে ষ্টেজে গেলাম, আর ওরা সব বলল,—এখন যাও, আমরা সাজ্‌ছি, দেখ্‌ছ না! হেসো না বিশ্বনাথ, অপর্ণা আরও কী বলল জানো? বলল,—আহা, ভারী ত সাজ! গোঁফ কাপিয়ে বুড়ো হাতিদের আবার মেয়ে সাজা!

এই সব কথা হ'চ্ছে ওর সংগে, এমন সময় তুপ্‌দাপ ক'রে তুমি এসে হাজির! সত্যি বল্‌ছি, তোমাকে আমি প্রথমটায় চিনতেই পারি নি বিশ্বনাথ। মুখে মেক্-আপ করেচো ত, পোষাক অবশ্য পরো নি, তখনো গায়ে গেঞ্জী র'য়েছে, কাঁধে তোয়ালে,—মানে, সাজতে সাজতে উঠে এসেছ আর কী! ওকে দেখেই ব'লে উঠলে,—এই যে। ঘন্টা প'ড়ে গেছে, ড্রপ তোলা যাচ্ছে না, এসো শীগগির? প্রথমেই তোমার নাচ, না?

—যদি না নাচি?

তুমি এ'কথা শুনে রেগে গিয়ে বললে,—দাদু, ওকে ব'লে

দিন, যেতে ওকে হবেই। প্রোগ্রামে নাম দেবার বেলা মনে ছিল না!

—ঈস্!—ও বললে,—দাহু, ওকে বুঝিয়ে দিন, প্রোগ্রামে নাম দিতে আমি চাইনি, ও-ই জোর করে ঢুকিয়েছে! কেন, ষ্টেজ্ থেকে নামিয়ে দেবার বেলা মনে ছিল না?

তোমাদের ঝগড়া দেখে হেসে ফেললাম। তোমার রাগ অবশ্য ততক্ষণে জল হয়ে গেছে! অদূরের ষ্টেজের আলোর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অনুনয়ের কণ্ঠেই ওকে বললে, ঘাট মানছি এবার এসো। দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখছ না? এই নাক মল্‌ছি, কাণ মল্‌ছি!

মেয়েটী ফিক্ করে হেসে ফেলল এবারে। তারপরে তোমরা ছুজনে চ'লে গেলে উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের দিকে,—পাশাপাশি। ভারী ভাল লাগছিল তোমাদের ছুজনকে একত্রে এভাবে দেখে! কতক্ষণ যে অন্যমনস্ক হ'য়ে তোমাদের দিকে অপলক তাকিয়ে ছিলাম, মনে নেই। চমক্ ভাঙতেই দেখলাম, তোমাদের অভিনয়ের যবনিকা উন্মোচিত হচ্ছে। ডাকলাম—হারু? বিপিন?

সাড়া নেই। ওরাও অভিনয় দেখেছে হয় ত! চ'লে গেলাম আমিও জনতার মাঝখানে। কয়েক জনের সংগে কয়েকটা টুকিটাকি কথাবার্তা, ভদ্রতার বিনিময়! নাচ-গান বক্তৃতা আবৃত্তি শেষ হ'লো, ছু'একজন ভালোই বললেন, আমি 'পেণ্ডুলাম' পড়লাম বিভূতিবাবুকে কিছু বল্‌বার কতো

অনুরোধ করা হ'লো, উনি কিন্তু ষ্টেজে কিছুতেই উঠ্লেন না। অথচ, উনি শুনেছি সুবক্তা, ইচ্ছা হ'লে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চমৎকার বলতে পারেন!······যাই হোক্, এর একটু পরেই মূল নাটক শুরু হ'লো।

রাজপ্রাসাদ। এক রাজা, রাণী আর রাজপুত্র। তার পরের দৃশ্য হচ্ছে এক শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য। রাজপুত্র বুঝি পথ হারিয়েছেন।

অরণ্যের প্রান্তে পর্ণ-কুটীর। দরিদ্র প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী। তাঁদের পরমাসুন্দরী তরুণী কন্যা। তৃষ্ণার্ত রাজপুত্রের প্রবেশ। প্রেম-সঞ্চার। কিন্তু এ' প্রেম পরিণয়ে পরিণত হ'লো না। রাজা চিনলেন ব্রাহ্মণকে, ব্রাহ্মণ রাজাকে। অতীতের দুই মহাশত্রু। ব্যর্থ মনোরথ রাজপুত্রের আত্মগোপন।

তারপর। অগ্নিদগ্ধ পর্ণকুটীর। রাজবিদ্রোহ। জনজাগরণ। প্রধান মন্ত্রণাদাতা ঐ ব্রাহ্মণ।

বিচারের আসনে এ' দৃশ্যে স্বয়ং রাজা। তরুণ বিদ্রোহী নেতার বিশ বছরের কারাদণ্ড। ছদ্মবেশী রাজপুত্র পিতৃদণ্ড মাথায় পেতে নিয়ে গেল, কেউ চিনল না।

বিশ বছর পরে। রাজা বৃদ্ধ। পুত্রশোকে রাণী ত মারা গেছেন। বন্দী-শালার দ্বার খোলা হলো, বন্দী নেতার মুক্তি। বৃদ্ধ রাজা হারানো পুত্রের আশায় দিন গুণ্‌ছিলেন। সেই পাগলিনী ব্রাহ্মণ কন্যা সন্ধান দিয়ে গেল, রাজপুত্র আর কেউই নয়, ঐ বন্দী নেতা! খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ। পাওয়া

গেল না রাজপুত্রকে। বিশ বছর অন্ধকার কারাকক্ষের নির্জনতায় কাটিয়ে অর্থসন্ধানী পেয়েছেন পরমার্থের সন্ধান। রাজপুত্র নিলেন গৈরিক বেশ। এদিকে রাজপ্রাসাদের অজস্র সম্পদ সম্ভারের মধ্যে মহারাজা এক বক্ষ-বিদীর্ণ হাহাকারে ভেঙে পড়লেন। কী হবে তাঁর অতুল ঐশ্বর্যে কী দিলে তাঁকে ঐশ্বর্য, যা তিনি যক্ষের মত আগলে রেখেছেন এত দিন ?···

অভিনয় শেষ হলো। আমার এলিয়ে পড়া শরীরটা দেখে মুখার্জী সাহেব বোধ হয় ভয় পেয়েই নাড়া দিতে লাগলেন আমাকে,—ও, বিজন বাবু, কী হ'লো আপনার ?

কে একজন বললেন,—জল আনুন, ফিট হয়েছে বোধ হয়।

ধীরে ধীরে উঠে বসলাম, না, কিছুই হয় নি, মাথাটা কেমন একটু ঘুরে গিয়েছিল বুঝি !

কোলাহলের মধ্যে উঠে দাঁড়ালাম। কেষ্ট আর কে কে যেন অতিথিদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। আমিও এগিয়ে গেলাম।

মুখার্জী সাহেব, মিসেস্ মুখার্জী আর বিভূতিবাবু হাঁটছিলেন পাশাপাশি। বিভূতিবাবু তোমাদের ভভিনয়ের প্রশংসা করলেন, কিন্তু সংগে সংগে আরও একটা কথা বললেন, যা' আমার অতীতের তুচ্ছ একটি ঘটনাকে তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়ে দিলো। উনি বললেন,—থিয়েটার হ'লো, এবার যাত্রা আনান বিজনবাবু, খাঁটি দেশী যাত্রা ওর মধ্যে একটা পাড়াগাঁয়ে ভাব আছে, থিয়েটারে কেমন যেন সহুরে গন্ধ !

যাত্রার কথায় আমার বিয়ের দিনের কথা মনে পড়ে গেল বিশ্বনাথ। আমরা প্রাচীন হয়েছি, আমাদের যৌবনে যাত্রার বেশ ঘটা ছিল। আমার বিয়ের সময় বাবা যাত্রা দিয়েছিলেন বাড়ীতে। সেই কেশী দৈত্যের বিকট হাসি, আর উর্বশীর ভয় পেয়ে দৈত্যর হাত ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা,—আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে!

কিন্তু সে সব থাক, মিসেস্ মুখার্জী কথায়-কথায় কী জিজ্ঞাসা করলেন জানো? বললেন,—আপনার ওখানে কেউই নেই দেখছি। আপনার স্ত্রী, ছেলেপুলেরা সব কোথায়?

বললাম,—আমার সহধর্মিণী বহুকাল মারা গেছেন। আর ছেলে, কানু? সে তার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতায় থাকে, এখানে আসেও না কখনো। বিভূতিবাবু শিশুর সারল্যে বলে বসলেন, সে কী! কেন?

বললাম,—প্রাচীন লোক। ছেলে অন্যজাতের মেয়েকে হঠাৎ বিয়ে ক'রে আনল, একটু বকেছিলাম। সেই যে চলে' গেল, আর এলো না, বুড়ো বাপের অপরাধ আজও ক্ষমা করল না।

একটুক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকবার পর বিভূতিবাবু বললেন,—বেশ গল্প লেখা যায় কিন্তু।

হেসে বললাম,—লিখুন না?

এইখানে প্রসঙ্গতঃ বহুদিন পরের একটা ঘটনা একটু বলে রাখি। এর পর থেকে বহুদিন ধরে উদগ্র কৌতুক মনে পোষণ

ক'রে আস্‌ছি ঐ গল্পটি কী লিখেছিলেন বিভূতিবাবু ? ··· না লেখেন নি। তবে দাদুর ঐ বাগান নিয়ে উনি লিখেছিলেন 'বেণীগির ফুলবাড়ী !' নার্সারীকে ফুলবাড়ী বলতেন বিভূতিবাবু। কিন্তু হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দাদু বলতে লাগলেন,—সেই পরিত্যক্ত মঞ্চের ওপর এ'সব আমি কতক্ষণ ধরে ভাবছিলাম জানি না; হঠাৎ চেয়ে দেখি, ব'সে পড়েছি একেবারে রাজসিংহাসনে। এখানেই ব'সেছিলেন বৃদ্ধ রাজা নাটকের শেষ দৃশ্যে। সামনে-পিছনে ঝুলছে আঁকা দুটো সিন, পাশ দিয়ে চোখে পড়্‌ছে আকাশ। স্তব্ধ রাত।

হঠাৎ মনে হ'লো, এ' যা, দেখছি, যা ভাবছি,—কিছুই সত্য নয়। ঐ প্যান্‌জির চারা, জিনিয়া, কস্‌মস্‌, করোনেশন, হলিহক্‌ ক্রাইসেনথিমাম্‌ ঐ ঝাউ আর ইউক্যালিপ্‌টাসের সারি ঐ মাঠ, ঐ বাড়ী, ঐ গাছপালা, ওগুলি মিথ্যা,—ও'গুলি স্বপ্ন, যেন জেগে উঠে হাত বাড়ালেই শূন্যে মিলিয়ে যাবে !···আর কী আশ্চর্য, ঠিক তার পরেই অনুভব করলাম, অনেকগুলি কণ্ঠস্বর যেন ঝঙ্কার হয়ে কানে এসে বাজল! অনেক আলো যেন জ্বলে উঠল! অনেক লোক, অনেক কোলাহল, অনেক ব্যস্ততা !··· ···

···সানাই বাজ্‌ছে। ভারী মিষ্টি আর মৃদু সেই সংগীতের মূর্চ্ছনা ! আমি শুয়ে আছি একটা ঘরে,—বাইরে অনেক লোকের পদশব্দ পাচ্ছি, অনেক হাঁকডাকও শুনতে পাচ্ছি যেন। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কাউকেই! তারপর ধীরে ধীরে সব

নীরব হয়ে এলো। বাইরে কোথাও রজনীগন্ধা ফুটেছে বোধহয়,—তারই অন্তরস্পর্শী গন্ধ ঢেউ তুলে ভেসে আসছে শুধু!

খুট্ করে দরজায় একটু শব্দ, কে যেন ঘরে ঢুকল, দরজা বন্ধ করল, তারপরে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো আমার কাছে।

রাত্রি শেষ হ'য়ে আসছে, বাইরে কাকও ডাকছে বোধহয় ছু-একটা,—আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি না বিশ্বনাথ, যাকে দেখলাম, তাকে এই এতকাল পরে ওভাবে দেখব তা' ভাবতেই পারি নি! সেই আমাদের বিয়ের প্রথমদিককার রাতগুলোয় ওকে যেমন দেখেছি একেবারে ঠিক সেই রকম! চমকে উঠে বস্‌লাম বিছানায়,—অস্ফুটস্বরে যেন বললাম,—তুমি!

সে একটু সলজ্জ হাসল শুধু। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি, কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল তাকে! ঝক্‌ঝকে জরির চুম্‌কি-বসানো একটা সূক্ষ্ম লাল শাড়ী জড়ানো সর্বাঙ্গে—গায়ের রঙ ধবেধবে ফর্সা, কালো কুঞ্চিত চুলে, সিঁথিতে টক্‌টকে লাল সিঁদুর-রেখা প্রসারিত হ'য়ে গেছে, ছোট্ট ললাটটিতে টানাটানা ছুই ভ্রূর মাঝখানে গোল ক'রে সিঁদূরের টিপ্ ছোঁয়ানো! ঐ চমৎকার ভাসাভাসা ভাবময় চক্ষু, ছুই ভ্রূর ছুই প্রান্ত দিয়ে রক্তিম কপোল পর্যন্ত নেমে এসেছে শ্বেত চন্দনের বিন্দু বিন্দু ফোঁটা,—আর লীলায়িত ভঙ্গীতে তুলে দেওয়া একটু ঘোম্‌টা,—ওকে যে কী অপরূপ দেখাচ্ছিল, তা' আমি ভাষায় বোঝাতে পারছি না! ছুজনেই রয়েছি ছুজনের দিকে চেয়ে, কেটে গেল অনেকক্ষণ। তারপরে সে কথা কইল, ঠিক যেন

গানের সুর এসে ছুঁয়ে গেল আমাকে, বলল,—এখনো ঘুমোও নি ?

—না। কিন্তু এতো দেরী করে আসতে হয় বুঝি ?

একটু হেসে একেবারে আমার কাছে এসে বসল, তোমাকে আর অপর্ণাকে পাশাপাশি দেখেছি বিশ্বনাথ, তাই তুমি বুঝ্‌বে ব'লে তোমাকে আজ সবই বলতে ভরসা পাচ্ছি,—আমার হাতে ধরা দিল তার নরম হাত। তারপর অতি আদরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল আমার মাথায়—গালে কপালে। খুব ধীরে ধীরে সে আবার কথা কইল, বলল,—বাড়ীর সবাই না ঘুমুলে কেমন ক'রে আসি, বলো ত ? আমার বুঝি লজ্জা করে না ?

টেনে নিলাম বুকের মধ্যে, বললাম,—এমন চমৎকার সাজিয়ে দিলো কে, আজ ?

—দিদিমা।

বহুক্ষণ যেন এইভাবে কেটে গেল চুপচাপ। বাইরে জ্যোৎস্নার কী রূপ! রজনীগন্ধার গন্ধ ব্যাকুল হ'য়ে ঘুরছে যেন!···হঠাৎ একসময় ধড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠে বস্‌ল, বলল,—ভোর হ'য়ে আসছে, এবার আমাকে ছেড়ে দাও লক্ষীটি, কেমন ?

—না।

—লক্ষীটি! বাড়ীর সবাই এখুনি জেগে উঠ্‌বে।

—না।

—না কেন ? আমি যাই, অবুঝ হ'য়ো না।

—না।

কিন্তু শুনল না। চ'লে গেল। অভিমান হ'লো ভয়ানক, পাশ ফিরে শুয়ে রইলাম। আর কখনো কথা বলব না, যতই সাধাসাধি করুক না কেন!

কিছুক্ষণ পরে কে যেন কাছে এলো মনে হ'চ্ছিল কে যেন আমাকে স্পর্শও করল, বলল,—শুনছেন?

চোখ মেললাম না।

—শুনছেন?

পাশ ফিরেই দেখি,—এক অদ্ভুত মূর্তি! মিশ্ কালো দেহের বর্ণ, বিরাট চেহারা, গায়ে বেশ জমকালো পোষাক, হাতে একটা দণ্ড। বলল, উঠুন, এবার উঠ্তে হবে আপনাকে।

কিন্তু মনে হ'লো এ'আমি কোথায়? মনে হলো, আছি এক অন্ধকার ঘরে, একবিন্দু আলো নেই কোথাও।

—শুনছেন?

বোকার মতো চাইলাম সেই অদ্ভুত মূর্তিটির দিকে।

—শুনছেন?

এবার উত্তরে আমার সমস্ত প্রাণমন হাহাকারে ভেঙে পড়্‌ল যেন,—নিয়ে যাও, আমার যা'কিছু আছে, সব নিয়ে যাও, আমার অর্থ-সম্পদ্, বাড়ীঘর সব কিছু! শুধু একটিবার, শুধু আর একটিবার আমার কানুর মাকে আমার সামনে এনে দাও আমি আর কিছুই চাই না!

মহাকাল নিরুত্তর।

—শুনছেন ?

অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলাম সেই নিশ্চল কঠিনতার দিকে।

—শুনছেন ? দাহু, ও' দাহু ?

চম্‌কে উঠে বল্‌লাম,—কে ?

—আমি কেষ্ট। কী সর্বনাশ করেছেন দাহু, এই শেষরাত পর্যন্ত এই ষ্টেজের মধ্যে চেয়ারে কাটিয়েছেন! কী হয়েছিল আপনার! মারা পড়বেন যে!

চোখ মেললাম ভালো ক'রে। দেখি, তুমি আর কেষ্ট। বুঝি ভয় পেয়েছিলে আমার অবস্থা দেখে, বিশ্বনাথ ?···না, মরব না,— বেঁচেই আছি।" ..

দাত্নর কাছ থেকে যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন প্রায় ভোর হ'য়ে এসেছে। কুয়াশা-কুয়াশামতন আবছা আলোয় পথরেখা খুঁজে নিয়ে ছ'একজন কারখানার সিফ্‌ট্‌ ডিউটীতে যাচ্ছে,— আমি সেদিনটা ছুটী নিয়েছিলাম, সুতরাং তাড়া ছিল না।

সাঁওতালদের পাড়ায় মুরগী ডাকছে, আমার ঘরের সামনের কুঠিগাছে একঝাঁক ছাতার পাখী উড়ে এসে ব'সেছে। আমাদের বাড়ীর প্রবেশপথে দরজা খুললে প্রথমেই আমার ঘর। কড়া নাড়লাম, অনুচ্চকণ্ঠে ছ'একবার ডাকলাকও,—বিপিন—বিপিন ?

দরজা সংগে সংগেই খুলে গেল, কিন্তু বিপিন নয়,— আরেকজন। ও'যে এমনভাবে এসে দরজা খুলে দেবে, ধারনাই করি নি !

—অনুচ্চকণ্ঠে বল্‌লাম,—বিপিন কোথায় ?

—ভিতরের দাওয়ায় ঘুমুচ্ছে।

—মা উঠেছে ?

বলল,—না, বুড়োমানুষ, ঐ অত রাত্রে থিয়েটার দেখে ফিরেছেন,—এরই মধ্যে উঠ্‌বেন কী করে ? দরজাটা বন্ধ ক'রে ঘরের ভিতরে এলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য সুন্দরই না না দেখাচ্ছে ওকে ! সদ্য-ঘুম-ভেঙে-উঠে-আসা মুখে বন্ধ জানালার কোনো কাঁচ দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়ছে,

পরণের শাড়ীতে এলোমেলো ভাব-ভঙ্গিতে একটা অলস শৈথিল্য! দেখতে দেখতে সংযমের বাঁধ হারিয়ে ফেলতে হয়! মুহূর্তের মধ্যেই ওকে দু'হাতে জড়িয়ে টেনে নিলাম বুকের কাছে। নিজেকে তখুনি ছাড়িয়ে নিলো না বটে, কিন্তু আমার আগ্রহান্বিত ওষ্ঠের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে চট্ ক'রে নামিয়ে নিলো মুখ, ওর কুমারী সিঁথির অগ্রভাগে দুই দ্বিধাবিভক্ত কেশবন্যার ঢেউ ঈষৎ উঁচু হ'য়ে দুপাশে নেমে গেছে,—আমার উদ্যত চুম্বন সেইখানে এসে ভেঙে প'ড়ে অবশেষে নিস্পন্দ হ'য়ে রইল। ···কয়েকটি স্বপ্নিল মুহূর্ত। তারপরেই ভঙ্গীতে ঈষৎ চাঞ্চল্য এনে অস্ফুটকণ্ঠে বলল—ছাড়ো।

—ছাড়্ব না।

—এই দেখ, ভয়ানক দুষ্টু ত?

নিজেকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে স'রে দাঁড়ালো, তারপরে দুটি আয়ত চোখে যেন নেমে এলো তিরস্কারের ঘন ছায়া, অস্ফুট চাপা কণ্ঠেই বলে উঠ্ল—দিন দিন সাহস বাড়্ছে দেখছি!

একটু হেসে বললাম,—কাল দাদুর সামনে অমন ঝগড়া করলে কেন?

—কাল!—সলজ্জ হাসির আভা আর তিরস্কারের কপট গাম্ভীর্য, দুই মিলিয়ে অপূর্ব এক ভঙ্গিমায় কেমন মাথাটা একটু দুলিয়ে দুলিয়ে বলে উঠ্ল,—কালকের কথা আর বলো না, ছিঃ!

হেসে বললাম,—কেন, 'ছিঃ' কেন ?

উত্তর দিলো,—লজ্জায় ম'রে যাই ! কেউ দেখে ফেলেছে কি না, কে জানে !

বললাম,—সিনের একেবারে পিছনে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে গল্প করছে,—লোকে যদি দেখেই থাকে, কী দোষ হ'য়েছে তাতে ?

ঈষৎ আরক্ত মুখে তখনো তিরস্কারের ভঙ্গী, বলল,—দুটি মেয়ে বুঝি ? আমি জানতে চাইলাম আমার সেই প্রশ্নের উত্তর, তুমি টেনে নিয়ে গেলে একান্তে একেবারে ষ্টেজের পিছনে। মেয়ের পোষাক ছিল ব'লেই কী তুমি মেয়ে ? ঐ কী মেয়ের ভাব ? ছিঃ !

আমি আপন মনেই হাসছিলাম, বললাম,—যাইহোক্, প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ ত ?

—ছাই উত্তর !

—আরও স্পষ্ট ক'রে বলব ?

এবার যেন কৌতুক ঝিলমিলিয়ে উঠল দুই চোখে, বলল, —কী বলবে ?

খপ্ ক'রে হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম,— ভালবাসি।

সমুদ্রের ঢেউ যেমন ক'রে ভেঙে পড়ে তীর-ভূমিতে, তেমনি ক'রে আমার বুকে এসে মুখ লুকাল অপর্ণা। আল্‌গা বাঁধভাঙা বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়্‌ল নরম আর কালো কেশের ঢেউ। কেমন অস্ফুট কাঁপা গলায় বলল,—আমার ভয় করে।

—কেন ?

—তুমি জানো না, কাল ঐ থিয়েটারের ঘটনার থেকেই আমার কেবল ভয় করছে। বেশ ত ছিলাম,—কিন্তু তুমি যতো অধীর হচ্ছো, আমার ততই মনে হচ্ছে,—সব যেন ভেঙে যাবে! যত কাছে আসছ তুমি, ততই ভয় পাচ্ছি,—ছিট্‌কে যদি দূরে সরে যেতে হয় দুজনকে!

হেসে বললাম,—এ' তোমার মিছে ভয়।

—না গো না,—মুখ তুলে বলল,—তুমি বোঝো না। ভালবাসায় নাকি অভিশাপ আছে।

—কে বললে তোমাকে ?

—একটা বইতে পড়েছি,—নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে দাঁড়ালো অপর্ণা, বলল,—আমার মন কী বলছে, জানো ? বাধা আসবে চারিদিক থেকে।

—বাধা !

—হ্যাঁ।—কেমন কান্নাভরা কণ্ঠে বলল,—ওগো, আমি বন্দিনী। তুমি কাছে এলে ভয় পেয়ে অম্‌নি চারিদিকে তাকাই,—কেউ দেখছে না ত! কত অনুচ্চারিত বিধিনিষেধ যে আমাকে ঘিরে আছে!

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলে উঠ্‌লাম,—কে দেবে আমাকে বাধা ? তোমার দাদা ? কখ্‌খনো না।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন অন্বেষণ করছে ও, বলল,—কিছুই বলা যায় না বাধা আসবে কোথা থেকে!

বললাম,—আমার মা বাধা দেবে না, আমি জানি।

—এও আগে থেকে বলা যায় না।

সবিস্ময়ে বললাম,—তার মানে! আমার মায়ের মনের কথা আমি…

বাধা দিয়েই শান্ত কণ্ঠে বলল,—শোনো! ভালবাসাটা মেয়েদের কাছে সমস্যা, তোমাদের কাছে নয়। আমাদের কথা আমরা যতটা জানি, তোমরা জানো না। কিন্তু, কেন ভাবছ এ'সব কথা? তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলব ব'লে মার কাছে শোবার ছল করলাম। লক্ষ্মীটি, আমাকে বোঝবার চেষ্টা করো।

—বেশ, বলো।

কিন্তু আশ্চর্য ওর মুখখানা! স্নেহে-মমতায় কী অপূর্ব কোমল যে হ'য়ে এলো ওর মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি, বলল,—রাগ ক'রো না। আমাকে অনুক্ষণই কাছে পেতে তোমার ইচ্ছা করে, আমি তা' জানি। কিন্তু…

—কিন্তু আমার সংগে দেখা করবে না, এই ত?

আমি অভিমান করলে মা যেমন আজো কাছে ব'সে বুঝিয়ে বুঝিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আমার মনের মেঘ দূর ক'রে দেয়, —ও' ঠিক তেমনি ক'রে আমার হাতখানা ধ'রে বলতে লাগ্‌ল,—করব। দেখ, যেভাবে ছিলাম, সেটাই কী এখন ভালো নয়?

—কীভাবে ছিলাম?

—কেন, তোমার দিনপঞ্জীর খাতা? আমার চিঠি, কণার চিঠি!

বলতে বলতেই চাপা হাসির আভায় ঝলমল ক'রে উঠ্‌ল ওর মুখ,—মায়ের স্নেহ-মমতার কোমলতা মিলিয়ে গিয়ে জেগে উঠ্‌ল প্রিয়ার কৌতুক আর চাঞ্চল্য, বলল,—একটি ছেলেকেই দুটি মেয়ে দু'দিক থেকে দেখল,—একজন দেখল তার ভিতরের দিক, আরেকজন বাইরের। হ্যাঁ গো, তোমার কল্পনার কণাই তোমাকে খালি চিন্‌ল, বাস্তবের অপর্ণা নয়?

বললাম,—অপর্ণা আর বাস্তব হ'লো কোথায় আমার কাছে?

—থাক্‌, থাক,—আর রাগ কর্‌তে হবে না! হুজুরে হাজির ত সর্বক্ষণই আছি!...এই শোনো না?

—কী?

—এইবার তুমি সত্যি সত্যি একটা গল্প লেখো। নাম-টাম সব বানিয়ে কিন্তু। দাঁড়াও, আমিই তোমাকে প্লট্‌ বলে দিচ্ছি।

—বটে?

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল,—পাড়ায় ঢোকবার মুখে পড়ে ঐ যে লাল দোতলা নিঃঝুম বাড়ীটা,—লক্ষ্য ক'রে দেখেছ? সেই যে এক ঘর কুনো বুড়ো থাকে? এমনভাবে লোকের দিকে তাকায় যেন সন্দেহ করছে। দেখলেই মনে হয়, বুড়োটার যেন ভয়ানক সন্দেহ বাতিক। লেখো না ওকে নিয়ে?

লোহার খাঁচায় ময়ূর পুষে রেখেছে বাড়ীতে, অথচ খেতে দেয় না। বুড়ী আছে বিছানায় শুয়ে বাতে পঙ্গু হ'য়ে, আর বুড়ো আছে সারা বাড়ীর খবরদারী নিয়ে, শুধু ময়ূরটাকে ছাড়া।

—ময়ূরের ওপর তোমার খুব টান!

—যদি দিয়ে দেয় আমাকে ময়ূরটা!

—বেশ হয়, না?

বলল,—হ্যাঁ। যখন মেঘ ঘনিয়ে আসে, বৃষ্টি নামে,—তখন কেমন ডেকে ওঠে খাঁচার মধ্যে বন্দী ময়ূরটা,—বড়ো কষ্ট হয়!

—সবার কষ্টই ত চোখে পড়ে শুধু……

—হয়েছে গো হয়েছে, আর দুঃখ করতে হবে না!

অতি অতর্কিতেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। বিদ্যুতের মতো আমাকে মুহূর্তে যেন জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটে চ'লে গেল অপর্ণা। প্রতিদান নয়, যেন প্রদীপশিখার স্পর্শ!

… … …

আবার সেই রকম অভিনব পত্র-বিনিময়। লিখল,—লেখা হ'লো গল্প? এদিকে পাহাড়ী বর্ষা নামল যে?

সত্যি দিক্‌বিদিক্‌-মুছে-দেওয়া অপূর্ব এ ঘাটশিলার বর্ষা! অতর্কিতে আসে, অতর্কিতে চ'লে যায়! কিন্তু চারিদিক মেঘে ঢেকে দিয়ে দিগন্ত থেকে দিগন্তে সাড়া জাগিয়েই আসে। আর আমাদের পল্লীটা মুখরিত হ'য়ে ওঠে সেই বন্দী ময়ূরটার আর্ত চীৎকারে। শুরু করলাম,—

লৌহপিঞ্জর ভেদ ক'রেও মেঘের সাড়া আসে। অদূরে বর্ষণস্ফীতা সুবর্ণরেখা, ওপারে উধাও মাঠ, তারপরে ঘনবিন্যস্ত বনরাজিনীলা, তারও পরে দূর-উদয়চক্রে পর্বত-তরঙ্গের শ্রেণী চ'লে গেছে। সেইখানে ঘনকালো মেঘ যখন থম্‌থম্ করতে থাকে, তখন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে ওর সমস্ত সত্ত্বা,—যেন জোয়ার আসে ওর জরাজীর্ণ দেহের শিরায়-উপশিরায়, রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস নৃত্য ক'রে ওঠে। লোহার তার ঘেরা ক্ষুদ্র পরিসরটির মধ্যেই যেন বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এসে ধরা দেয়, ও তখন ভুলে যায় বন্ধন, ভুলে যায় সীমার ক্ষুদ্রতা, ভুলে যায় দেহের অকারণ ক্লান্তি, উন্মত্তস্বরে ডেকে ওঠে প্রাণপণে!

দোতলার জানালাটা খুলে দিয়ে কোন-কোনদিন শিকগুলি দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে আলুলায়িত কুন্তলা অবন্তী (কী নাম দেবো? অবন্তীই থাক্। 'অবন্তী' নামটা হঠাৎ এসে গেল কেন কে, জানে? 'অপর্ণা'র 'অ' এবং 'অবন্তী'র 'অ'তে মিল আছে বলে?)—চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্ত থেকে ঝাপ্‌সা পাহাড়ের সারি ঘনবর্ষণধারায় মুছে গেছে! সেই সময় ছোট্ট খাঁচাটায় ময়ূরটা হঠাৎ অস্থির হ'য়ে ঝট্‌পটিয়ে ওঠে, উড়্‌তে চায়, পারে না, করুণস্বরে ডাকতে থাকে।

ওঘরের প্রান্তে খাটের ওপর শুয়ে আছেন সুনীতি দেবী। (অপর্ণা বাতে পঙ্গু 'বুড়ী'র কথা বলেছিলে, নাম বলে নি,— 'সুনীতি'ই থাক্।) কতদিন ধ'রে যে শুয়ে আছেন, কত মাস, কতবছর, তা যেন হিসাবেরও অতীত। অবন্তী যখনই যায় ওঁর

ঘরে ওষুধ খাওয়াতে, তখন রোজই তিনি করগণনা শুরু করবেন, বলিস কী, এতগুলো দিন আমি বিছানায় প'ড়ে আছি! হায় ভগবান!

—জ্যেঠি,—অবন্তী বলে, ফের কাঁদছ, এখ্খুনি গিয়ে জ্যেঠামশায়কে বলে দিয়ে আসব।

—যা না, এখ্খুনি যা, আমায় এসে মেরে ফেলতে বল! আমি মরলে তোর জ্যাঠাত বাঁচে, সাত তাড়াতাড়ি আর একটি বিয়ে করে আনবে'খন।

বলতে-বলতে কালীমায় ভরা রোগজীর্ণ শীর্ণ মুখখানা অতর্কিত উত্তেজনায় ভরে ওঠে,—অবন্তী তাড়াতাড়ি পাখা নিয়ে শিয়রে দাঁড়ায়, কিন্তু সব-সময় ফল হয় না, কোন-কোন দিন হাত পা ছুঁড়ে প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠেন সুনীতি,—আমার কাছে কেন, যাও না জ্যেঠার কাছে, মুখপুড়ী, এরই মধ্যে ত বাপ মা-ভাইগুলোকে একে একে পেটে পুরে বসে আছ, এখন আমার সংসারেও আগুন জ্বালাতে চাস!

অবন্তী নিশ্চুপে হাতের পাখাটা নাড়ে, কিছু বলে না, ওসব তার গা-সওয়া! মেঝেয় বসে থাকা ঝি-টি কিন্তু আপন মনে অস্ফুট ঝংকার দিয়ে ওঠে, যথেষ্ট ভোগান্তি আছে দিদি-মণি, ও'বুড়ী কি আর সহজে মর্‌বে!

সেদিন ডাক্তার ব্যানার্জী ত বলে গেছেন এই কথা। বেশীদিন আর নয়, বিকার দেখা যাচ্ছে, স্পষ্ট মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ!

—ও পাগলী বুড়ীর কথায় তুই কিন্তু রাগিস না মা!—মাঝে মাঝে জ্যেঠামশায়ের কণ্ঠে অভাবিত অদ্ভুত স্নেহের স্বর ফুটে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য, অবন্তী তাঁকে আজও পর্যন্ত চিনে উঠতে পারল না। নীচের ঘরে থাকেন। ঘরভর্তি আলমারী-ঠাসা যত রাজ্যের পুরাণো আইনের বই। সেইগুলি উল্টে পাল্টে পড়েন তিনি। ওর বাবারও এই রকম অনেক বই ছিল। মৃত বাপ-মার কথা মনে হ'লে অবন্তীর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বহু পূজা-অর্চনার ফলেই নাকি সে এসে ছিল বাপ-মায়ের কোলে। তার ভাই হ'তো, কিন্তু বাঁচত না। সে-ই একমাত্র বেঁচে রইল। বাপ-জ্যেঠামশাই, দুই ভাই,—জ্যেঠামশায় নিঃসন্তান, বংশের সে-ই একমাত্র মেয়ে।

জ্যেঠামশায়ের ঘরে আর একটি জিনিষ আছে, সেটি একটি লোহার সিন্দুক। পাড়ায় রটনা, সকালবেলা জ্যেঠা-মশায়ের মুখ দেখে উঠলে নাকি হাঁড়ি ফাটে। সিন্দুকে কী আছে, অবন্তী তা' জানে না। লোকে বলে, তার জ্যেঠামশায় নাকি মস্ত বড়লোক। হবেও বা। তবে একমাত্র এই বাড়ীটা ছাড়া আর তার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না, কী ব্যসনে কী ভূষণে! আর আছে বলবার মধ্যে ঐ বদ্ধ-খাঁচার জীবটা একদা যৌবনে ওটা নাকি সখ করে পুষেছিলেন তার জ্যেঠিমা জ্যেঠামশায়ের সংগে অনেক ঝগড়া করে। এক কালে জীবটির যত্ন ছিল, আজ আর নেই, ঝি-টি দয়া করে কোন দিন খাবার

দেয়, কোনদিন দেয় না। দুর্বিষহ বন্দীত্বে জরা-দুর্বল দিনগুলি ওর কোন রকমে গড়িয়ে চলেছে।

অবাক হ'য়ে যায় অবন্তী, জ্যেঠিমা মাঝে মাঝে কিন্তু ভারী স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেন। সেদিন রাত্রে জ্যেঠামশায় একবার এসেছিলেন জ্যেঠিমার ঘরে। কপাটের আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছিল অবন্তী,—জ্যেঠি বলছে,—হ্যাঁগা, তুমি করছ কী, অবন্তীর একটা বিয়ে দাও, মেয়ে যে এদিকে বুড়ী হয়ে গেল!

—দেখ,—গম্ভীরকণ্ঠে জ্যেঠামশায় বললেন,—কুড়িতে পড়লেই মেয়েরা বুড়ী হয়ে যায় নাকী? তাছাড়া, ও'মেয়েকে দেখলে কে বলবে যে ষোল পেরিয়েছে! বিয়েটা একটা খেলার ব্যাপার নয়। আমার টাকাই বা কই, এ'বাজারে বিয়ে দেওয়া ···

—বুঝেছি, বুঝেছি!—আবার সেই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় অস্থির হ'য়ে ওঠে জ্যেঠি,—ওর বিয়ে দিলে তোমারই বা চলবে কেন?

—সুনীতি!—যেন বজ্র গ'র্জে ওঠে জ্যেঠামশায়ের কণ্ঠে।

—জানি, জানি, সংসারে আমার আগুন লেগেছে!—আকুল হ'য়ে কাঁদতে থাকে জ্যেঠিমা।

এ'ঘরে শূন্য শয্যায় অবন্তীও হঠাৎ উচ্ছসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে। ঘন আর নিবিড় অলকগুচ্ছ এলোমেলো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে, বেশবাস বিস্রস্ত, উচ্ছলিত নিটোল তনুদেহে তরঙ্গ উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে!

দরজার কাছে পায়ের শব্দ। ধড়মড় ক'রে উঠে বসে অবন্তী। পরমুহূর্তেই ভেসে আসে জ্যেঠামশায়ের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, অবন্তী, একবার এসো আমার ঘরে।

মাঝে মাঝে অবন্তীর ভারী ভয় হয় জ্যেঠামশায়কে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ-বাড়ীর হাওয়া ভয়ানক বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে!—এখানে স্বচ্ছন্দে শ্বাস নিতেও যেন কষ্ট!

—দেখ মা—জ্যেঠামশায় তাঁর ঘরে পায়চারী করতে করতে বলেন,—লোকে তোর বিয়ের কথা বল্‌ছে। কিন্তু আমি বলি মা, তুই বিয়েই করিস না। তরুণ বয়সে স্বপ্ন তোরা দেখিস্ কিন্তু মা, ওটা মরীচিকা। শুধু পথই ভোলায়, পথের সন্ধান দেয় না!

স্বল্পালোকিত ঘরখানার বড়ো অদ্ভুত দেখায় জ্যেঠামশায়কে, বড় ভীষণ, বড় ভয়ঙ্কর!

—অবন্তী!—জ্যেঠামশায় কাছে এলেন, তারপরে একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন,—আচ্ছা যা, রাত হ'লো, শুয়ে পড় গিয়ে।

অবন্তীর ঘর। দরজায় খিল দিয়ে আবার বিছানায় এলিয়ে পড়ে অবন্তী। বহুদূর দৃষ্টি যায় জানালা দিয়ে। ওদের বাগান যেখানে শেষ হয়েছে, তার পাশেই ছোট একতলা বাড়ী। ওদেরও ঐ ঘরটায় জানালার আলো। সে এখন কী করছে কে জানে! হয় ত তারও চোখে আজ ঘুম নেই, উদাস দৃষ্টি মেলে বৃষ্টি দেখছে।

সে-সে ! নিখিলেশ···নিখিল ! যার মধ্যে মুহূর্তের জন্য তার বিশ্ব-নিখিলকে দেখেছে অবন্তী !

একতলা বাড়ী কিছুদিন হ'লো ভাড়া নিয়েছে নবাগত এক চেঞ্জারের দল। কয়েটি মেয়ে আছে, খুব ফর্সা দেখতে ভয়ানক দেমাক, কারুর সংগে আলাপ করে না। আর আছে গুটি তিনেক ছেলে, বড়টি বছর বারোর বেশী নয়, ওদেরই ভাই হবে নিশ্চয়, অনেকটা ওদেরই মতো দেখতে।

কিন্তু সে ওদের দলের হয়েও এদের সংগে তার খাপ খায় না। তার বর্ণ কালো, চুল কোঁকড়ানো, চোখের দৃষ্টি ভারী অদ্ভুত ! আর তার হাসবার ভঙ্গী ? কী চমৎকার !···রাস্তার ধারে সেদিন দাঁড়িয়েছিল সে, আর অবন্তী বাগানের মধ্যে। দেখতে পেয়েই সে বলেছিল,—আপনাদের ময়ূরটা ভারী সুন্দর ত ! দেবেন আমাকে ? ওদের ব'লে ক'য়ে আমি নিশ্চয়ই পুষব !

অবন্তী উত্তর দেয় নি, পালিয়ে গিয়েছিল,—এই প্রথম দিনের আলাপ। এবং আশ্চর্য, এই তার জীবনে সত্যিকার প্রথম পুরুষের ছায়াপাত ! তারপরে কয়েকবার দেখা হয়েছে। অবন্তী জানালায় আর সে পথে। কিন্তু সেদিন দুপুরে ? আজও তার কথাগুলি মধুর হয়েই কানে এসে বাজ্‌ছে যেন ?

একেবারে চ'লে এসেছিল বাগানের মধ্যে, বাড়ীর কাছে।—এই দেখুন, মানুষের হৃদয়ের কথা এক মানুষ ছাড়া আর সবাই বোঝে খুব সহজে। সেদিন ময়ূরটা চেয়েছিলাম, আপনি দেন নি, যাকে চেয়েছিলাম, সে নিজেই উড়ে গিয়ে হাজির !

—ওমা !—অবন্তী অবাক হ'য়ে যায়,—গেল কী ক'রে ?

—নিশ্চয়ই খাঁচা ছিল ভাঙা ?

দু'জনে এগিয়ে যায়।—ঐ দেখুন, যা বলেছি ঠিক তাই, খাঁচার ঐ কোণটা ভাঙা। তারপরে হেসে ময়ূরটাকে ভিতরে গলিয়ে, কয়েকটা কঞ্চি নিয়ে পুঁতে দেয় ভাঙা যায়গায়, তারপরে সহাস্যে বলে,—হবেনা ত, খাঁচার জিনিষ খাঁচাতেই রেখে দিলাম। আমি কী আর সত্যিই চাইছিলাম ? রাখব কোথায় ? আপনি দেবার মতো উদার কিনা সেইটাই পরখ করছিলাম।

অবন্তী নীচু গলায় কী যেন কেষ্টা বলেছিলে। আবার সেই হাসি,—ওরা আমার কেউ নয়, আমি ওদের বাড়ীর মাষ্টার। গানও শেখাই, লেখাপড়াও করাই, ওঁরা কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন টেনে, কী আর করি চলে এলুম। দেশটাও ত দেখা হলো !

লজ্জা যেন ভাঙতেই চায়না অবন্তীর, তবু দু'একটা কথা কী যেন সে বলেছিল।

—ওদের নিয়ে বেড়াতে যেতে হয় বই কি ! হরদমই যেতে হচ্ছে ! কিন্তু সত্যি বলতে কী, ওদের ভাল লাগেনা, ওরা বড্ড মেকী, সাজ-পোষাক নিয়েই ব্যস্ত ! সাবধান, একথা যেন ওদের কানে না যায় ! বিশেষ করে বড় মেয়েটা, যার নাম রমা। ও যেন টের না পায়, আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলবে তাহলে !

অবন্তী এবারেও কথা বলেছিল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—যাবই ত! এক্খুনি যাচ্ছি। আপনার জেঠামশায় বকবেন বুঝি?

—হ্যাঁ!

—আমারই মত। আমাকেও ওঁরা বড্ড শাসনে রেখেছেন। আচ্ছা আপনার এমন চমৎকার চুল। আপনি খোঁপা বাঁধেন কেন, এলো করে রাখবেন, ভারী স্থন্দর দেখাবে। আর চোখে দেবেন কাজল, অতি চমৎকার মানাবে আপনার চোখে!

—আপনি এখন যান। কেউ দেখে ফেলবে!

—ভয় করছে বুঝি? আমারও ভয় করে। ভালো কথা, আপনার নামটা যেন কী?

—অবন্তী!

—অবন্তী! বেশ নাম। আপনার উপযুক্ত নাম। অবন্তী সেকালের সম্পদশালিনী নগরী,—আপনিও সেকালের, একালের অন্তঃসারশূন্যতা আপনার মধ্যে নেই। আচ্ছা আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন না?

আমার নাম নিখিল। সর্বনাশ, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়! ঐ দেখুন হন্‌হন্ করে রমা আসছে এদিকে!

সেই ফর্সারঙ্ দাম্ভিকা মেয়ে রমা কঠোর ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো,—কি হচ্ছে নিখিলদা? দুপুর বেলা বাড়ীর সব ঘুমুচ্ছে, এই স্থযোগে তুমি দিব্যি পালিয়ে এসেছ দেখছি! লজ্জাও করে না, এসোনা একবার, আমি মাকে, বাবাকে সকলকে বলে

দোব। এই কীর্তি! একরকম হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতেই তাকে নিয়ে গেল মেয়েটি!

স্তম্ভিত একখণ্ড নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়িয়েছিল অবন্তী। পেছন থেকে গম্ভীর কঠোর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো জ্যেঠামশায়ের—অবন্তী!

যেন সাপ দেখে হতচকিত হয়ে উঠ্‌ল অবন্তী।

সিঁড়ি দিয়ে এক পা এক পা করে নেমে এলেন জ্যেঠামশায়, সরে এলেন খুব কাছে, তারপর সে যেমন বলেছিল চুল এলো করলে ভালো দেখায়, তেমনি এলো হয়ে গেল অবন্তীর চুল, জ্যেঠামশায়ের শক্ত হাড়ের মত শীর্ণ হাত দৃঢ় কঠোর মুঠিতে চুল সজোরে আকর্ষণ করল।

—আমার এই তীক্ষ্ণ চোখ দুটো ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়, একপ্রকার অসম্ভবই মনে করতে পারো।

নীচের একটা পরিত্যক্ত ঘরের কোনে অবন্তী আবদ্ধ হলো। তার মধ্যে সজোরে ঠেলে দিয়ে জ্যেঠামশাই দরজা দিলেন তালা বন্ধ করে।

—ছেলেটাকেও শাস্তি দিতাম, শুধু দিলাম না লোক-জানাজানির ভয়ে—কলঙ্কের ভয়ে।

অবন্তী অন্ধকার ঘরের মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠল!

—কাঁদো, কিন্তু আস্তে। তোমার জ্যেঠিমার কানে যদি যায় ত আস্ত রাখব না!

ভয়ে কেঁপে ওঠে, তারপর মুখে আঁচল গুঁজে কান্নার রুদ্ধ

আবেগ বন্ধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে অবন্তী !

সন্ধ্যার কিছু আগে দরজা খুলে যায়। আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে অবন্তী। অঙ্গের বসন সম্পূর্ণ এলোমেলো।

জ্যেঠামশায় কাছে এসে ডাকল...অবন্তী ?

অবন্তী তাড়াতাড়ি উঠে বসে।

—এসো, কথা আছে।

মাথাটা তখনও ঝিম্-ঝিম্ করছে। সেই অবস্থায় ধীর পায়ে জ্যেঠামশায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকতে হয়।

—বোসো, ঐ চেয়ারটায়।

বসে।

—দেখ, তোমাকে ঘরে বন্ধ রেখেছিলাম বলে নিশ্চয়ই রাগ করেছ। ভেবেছ, ভয়ানক নিষ্ঠুর আমি। ভাবো, ক্ষতি নেই কিন্তু আমি জানি কঠিন কর্তব্য বোধেই আমাকে এতটা কঠোর হতে হয়েছে। পায়চারী করতে লাগলেন জ্যেঠামশায়,—আমার কর্তব্য আমার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা আমার পরবর্তী কালকে দিয়ে যাওয়া! সেই শিক্ষাই তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। তোমার মত তরুণ-বয়সে আমিও স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু স্বপ্ন আর জীবন এক নয়।

জ্যেঠামশায় আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ওপর থেকে দুড়্ দুড়্ করে ঝিটা নেমে এলো।

—বাবু,—দিদিমণি—শীগ্গীর আসুন মা কেমন করছে !

অবন্তী উঠে দাঁড়াল। জ্যেঠামশায় ধীর গম্ভীর কণ্ঠে

ডাকলেন,—এই ঝি, শোন ?

ঝি সরে এলো।

—আমরা যে দুজনে এ ঘরে রয়েছি, তোর মা জানে ?

—হ্যাঁ।

—হুঁ, বুঝেছি। আচ্ছা যা। আমরা যাচ্ছি। ওরা গেলেন। জ্যেঠিমার দেহটা শক্ত, ধনুকের মত বেঁকেছে, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, ঠোঁটে অল্প অল্প ফেনা, জ্যেঠিমার ফিট্ হয়েছে। এলো জল একটু পরেই, অবন্তী চোখ-মুখে-মাথায় দিতে লাগল জল। ঝরতে লাগল বাতাস, জ্যেঠামশায় স্থির দৃষ্টি মেলে শুধুই দেখছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই যা হোক জ্ঞান ফিরে এলো, কিন্তু দুর্বলতা অত সহজে গেল না।

পরের দিনের কথা বলছি। সমস্ত মধ্যাহ্ন জুড়ে আকাশ নীল ছিল। এলো অপরাহ্ন। পর্বত শ্রেণীর ওপারে দেখা গেল মেঘ। সন্ধ্যার আগেই আকাশ ভরে গেল মেঘে।

অবন্তী আজ সারাটা দিন কী করেছে কে জানে।

হয়ত ভেবেছে আকাশ-পাতাল তার নিজের কথা। ভেবেছে জ্যেঠামশায় জ্যেঠিমার কথা। হয়ত ভেবেছে আরও এক-জনের কথা।

সন্ধ্যায় জ্যেঠামশায়ের ঘরে তাঁর সামনে আবার দাঁড়াতে হ'লো অবন্তীর। নিস্তেজ সাপুড়ের সাপকে বারবার শুনতে হয় সাপুড়ের সেই একঘেয়ে একটানা বংশীধ্বনি!

কিন্তু হঠাৎ সে'সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমে এলো। জ্যেঠা-

মশায় থেমে গেলেন, বললেন,—জল এলো। জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে যা ত অবন্তী।

বন্ধ হ'লো জানালা।

—আচ্ছা, এবার যেতে পারিস।

আশ্চর্য, ইজিচেয়ারের মধ্যে এলিয়ে প'ড়ে জ্যেঠামশায় তুই হাতে মুখ ঢাকলেন।

বাইরে অবিরল বৃষ্টি। অবন্তী ধীর পায়ে নিজের ঘরে এলো। এ-কী! তু'চোখ ভরে এখনো স্বপ্ন দেখছে না ত অবন্তী!

টেবিলের ওপর আলো। একটী বই খুলে নিয়ে সাম্‌নে ব'সে আছে, আর কেউ নয়, স্বয়ং নিখিলেশ!

—এ-কী! আপ···আপনি!

চমৎকার হাসল সে, বলল,—হ্যাঁ, আমি।

—কী ক'রে এলেন?

—এলেন নয়, বলো,—এলে। হ্যাঁ, এলাম। ওদের সংগে তোমাকে কেন্দ্র ক'রেই প্রচণ্ড ঝগড়া।

এই রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে রমা বলল, বেরিয়ে যাও! তাই বেরিয়ে এলাম এবং চিরতরেই।

অবন্তী দাঁড়িয়ে রইল। সব মিলিয়ে কিছুই যেন বিশ্বাস-যোগ্য মনে হচ্ছিল না। স্বপ্ন নয় ত?

—সোজা গেট্ খুলে চ'লে এলাম,—সে বলতে লাগল,—নীচের ঘরে তোমাকে দেখলাম,—তোমার জ্যেঠামশায়ের সংগে

কথা কইছ। ভিজে পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে ওপরে চ'লে এলাম, আন্দাজে বুঝলাম এই-ই তোমার ঘর।

আবার সে হাসল, বলল,—আমাকে কি তাড়িয়ে দেবে ?

কী হ'লো কে জানে, হঠাৎ অবন্তী নিখিলেশের কোলের ওপর মুখ রেখে ভেঙে পড়্‌ল কান্নায়,—বাঁচাও আমাকে, এই প্রেতপুরী থেকে নিয়ে চলো, এখানে থাকলে মরে যাব।

সস্নেহ করস্পর্শে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল নিখিল।

এমনিই হয়। দুঃসহ বেদনার চাপে অকারণ গোপনীয়তা দুরন্ত লজ্জা, সমস্ত ভেঙে যায়, বেরিয়ে আসে আলো ঝলমল মুগ্ধ প্রেম, তার প্রোজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত অন্ধকার মুহূর্তে মুছে যায়।

নিখিল ডাকল,—অবন্তী, বন্তী, অবু !

—উঁ ?

—কেউ যদি এখন আসে ?

—আসুক।

—ধরো যদি জ্যেঠামশায় নিজে।

—আসুক মেরে ফেলুক আমাকে।

নিখিল ওর মুখখানা দু'হাতে তুলে ধরল।...

বাইরে তখন অবিশ্রান্ত বর্ষণ। লৌহপিঞ্জর মধ্যে ময়ূরটা তখন একবার থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। যেন জোয়ার এসেছে ওর জরাজীর্ণ দেহের শিরায়-উপশিরায়, ক্ষুদ্র পরিসরটির মধ্যেই যেন

ধরা দিয়েছে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, ও' ভুলে গেল বন্ধন, দেহের ক্লান্তি, সীমার ক্ষুদ্রতা,—উন্মত্তস্বরে ডেকে উঠ্‌ল। আকাশ থেকে সাড়া এলো ঘন-গভীর মেঘ-ডম্বরুর। দরজায় কার যেন ছায়া। নিখিল চম্‌কে বলল,—কে ?

কোথা থেকে দুঃসাহস এলো অবন্তীর কণ্ঠে, বলল,—কেউ নয়, তুমি চুপ করো লক্ষ্মীটি !

অথচ, আমরা জানি সে ছায়া জ্যেঠামশায়ের। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ওরা এড়াতে পারে নি। কিন্তু তিনি আজ চুপি চুপি পালাতে লাগলেন—তাঁর নিজের ঘরে,—যুদ্ধক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত, পরাজিত সৈনিকের মতো !

চিঠি এলো যথারীতি, বুড়ো-বুড়ী আর ময়ূরের খোঁজ ত আমিই দিয়েছিলাম। 'অবন্তী'টা কে? নিখিলেশই বা কে? আর, রমা?

উত্তর দিলাম—অবন্তী-নিখিলেশ যে কারা, তা কি বুঝিয়ে বলতে হবে? আর, রমা? কেন, পাড়ায় কী 'অপর্ণা' ছাড়া মেয়ে নেই? পাড়ার যে-কোন মেয়েকে 'রমা' বলে কল্পনা ক'রে নিতে পারো। কিন্তু, আসল কথাটার আবেদন ব্যর্থ হয়নি ত? সত্যিকার ভালবাসা যে-কোনো বাধাকেই অতিক্রম করতে পারে,—আজ বর্ষার দিনে এই বাণীই পাঠালাম প্রিয়ার উদ্দেশে। ভালকথা, গল্পটি লিখে খুশী করতে পেরেছি ত? এ অবস্থায় লোকে কবিতা লেখে, আমি লিখ্‌লাম গদ্য,—অবশ্য ভরসা আছে, স্বাধীন মনে এ'কাজ করি নি, এর পিছনে একজনের প্ররোচনা ছিল।

কিন্তু, এরপরে আর চিঠি নেই। তিনদিন-চারদিন কেটে গেল। ও' একেবারে নীরব। ভয়ানক অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল মনটা। কী হ'লো ওর?

কারখানার কাঁচের ঘরে বসে কাজ করতে উদাস হয়ে যায় মন। ফাইলের স্তূপ ঠেলে ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াই। ঘুরে আসি এদিক-ওদিক। সব ডিপার্টমেণ্টেই আমার পরিচিত

বন্ধু-বান্ধবের দল। যে-যার নিজের কাজ করে চলেছে। দু'-একজনের কাছে বসি, আবার উঠে পড়ি। তারপরে গেলাম ক্যান্টিনে চা খেতে।

অসময়ে ক্যান্টিনে ভীড় নেই একেবারে, এককোণে ব'সে আমার পরিচিত একটি লোক পকৌড়ি চিবুচ্ছে শালপাতার ঠোঙা থেকে, পাশে রেখেছে বেশ বড়ো কাঁচের গেলাসে ধূমায়িত চা। লোকটি কাজ করে তামা-ঢালাইয়ের ডিপার্টমেণ্টে, আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়ো,—দুটো পা হাঁটু পর্যন্ত মোটা ক্যাম্বিশে ঢাকা, হাতে ও মোটা দস্তানা ছিল, সেটা খুলে রেখেছে কোলের ওপর। চোখে ওয়েল্ডিং-চশমার মতো ফিতে বাঁধা চশমা, সেটা গলায় এখন ঝুলে র'য়েছে। আমাকে দেখে কলরব ক'রে উঠ্‌ল লোকটি, বলল,—আসুন—আসুন, কী আশ্চর্য, অসময়ে চাঁদের উদয়! ওরে চা দে······

একটু হেসে আসন গ্রহণ করলাম। ভদ্রলোকটির কোলাহল তখনো থামেনি, কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বলল,—কী ব্যাপার দাদা, লোকালয়ে যে কান পাতা দায়!

—কী রকম?

চোখ নামিয়ে বলল,—প্রেমপর্ব কতদূর এগোল?

—মানে!

পিঠ্ চাপড়ে দিয়ে হেসে উঠ্‌ল, বলল,—বহুৎ আচ্ছা দাদা! এই ত মরদের বাচ্ছা! ছাড়বে কেন, টোপ্ যখন গিলেছে, খেলিয়ে বেড়াও! কিন্তু খবরদার ভায়া, বিয়ে-সাদী করো না।

—কেন ?

—কেন !—চায়ের গেলাশে সরবতের মতো বড়ো চুমুক দিয়ে ঠক্ ক'রে নামিয়ে রাখল গেলাসটা, বলল,—আমি ভাই ঠকেছি জীবনে। প্রেম-করা মেয়েকে কখনো বিয়ে করতে নেই !

হেসে বললাম,—বৌদির সংগে আলাপ নেই, নইলে কথাটা তাঁকে ব'লে আসতুম।

হাসির উদ্বেল ঢেউ মুহূর্তে শুষে নিল কে যেন মুখ থেকে, ভদ্রলোক সংগে সংগেই গম্ভীর হ'য়ে গেল, বলল,—আলাপ নেই বুঝি ?

—না ত। কবে আর আপনার বাড়ী নিয়ে গেলেন আমাকে !

—বাড়ী—লোকটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো, —আপনি কী কিছুই জানেন না ? কিছুই কি শোনেন নি আমার সম্বন্ধে ?

—না ত, কী শুনব !

একটা পকৌড়ি চওড়া শক্ত হাতের মুঠোয় অনর্থক পিষে পিষে ফেলে দিলো বাইরে, বলল,—বেশীদিন ত এখানে আসেন নি, তাই জানেন না। আমার হ'য়ে গেল এগারো বছর। এ'কারখানা ভাই একটা আজব দেশ। আপনি যে ক্যাম্পের কোয়ার্টারে না থেকে বাইরে বাসা ভাড়া নিয়ে আছেন,—বেশ ভালই আছেন। এ'বড়ো পাজী যায়গা। চিম্‌নীর কালো

ধোঁয়া লেগে-লেগে যায়গাটাই শুধু কালো হ'য়ে যায় নি, মানুষের মনও কালো হ'য়ে গেছে!

কেমন বিষণ্ন দেখালো ওর মুখ। লোকটির পুরো নাম জানি না, দাশবাবু-দাশবাবু বলে লোকে ডাকে,—কথাবার্তায় মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম-অঞ্চলের একটু টান পাওয়া যায়,—হয়ত চট্টগ্রাম থেকেই এসেছিলেন দাশবাবু। ছয় ফুটের ওপর লম্বা দেহ,—বাঙালীর পক্ষে বেশ অস্বাভাবিক ভালো স্বাস্থ্য। আগাগোড়া ক্যাম্বিশের পোষাক নিজেকে ঢেকে এস্কিমোদের মতো চেহারায় তামা-ঢালাইয়ের ফার্ণেসের সামনে দাঁড়িয়ে লোহার হাতায় টগ্‌বগ্‌-করে-ফোটা তরল তামা নিয়ে সাজানো ইন্‌গটের ছাঁচের ওপর ঢেলে দেওয়ার কাজ করতে হয় ওকে,—একদল পাঠান-পাঞ্জাবীর পাশে পাশে ওকে সেই কাজ করতে কতদিন দেখেছি! দেখে দেখে চমৎকৃতই হ'য়েছি, আলাপ করেছি লোকটির সংগে। একসংগে ঘণ্টাখানেক কাজ করার পর ওদের আধঘণ্টার বিরাম। সেই সময় মুখের-হাতের-গায়ের ক্যাম্বিশ খুলে রেখে ঘামে-জল-হওয়া শরীরটাকে টেনে ক্যান্‌টিনে নিয়ে আসা,—কারখানারই দেওয়া ভারী বুটের তলায় থাকে লোহার খুর,—সেই খুরে খটাখট্ শব্দ তুলে শানের ওপর দিয়ে চ'লে যাওয়া। তারপরে একগ্লাস চা আর পকৌড়ি। এগারো বছর ঢালাইয়ের কাজ ক'রে চলেছে দাশবাবু,—তামাটে শক্ত মুখ, শক্ত চোয়াল আর খড়্গ নাক। ছোট গোল গোল চোখ দুটো সবসময়ই ঘোলাটে লাগে দেখতে।

দাশবাবু বলল,—কারখানায় সব আলোচনাই হয় মশাই। হাঁড়ির খবরই লোকের মুখে মুখে। আপনার কথা জানলাম কেমন ক'রে? আপনি ত নিজে বলেন নি,—অথচ, সবাই জানে। এমন কি ম্যানেজার রবার্ট পর্যন্ত জানে ব'লে আমার সন্দেহ হয়।

—বলেন কী!

রবার্ট-সাহেবের কাণ্ড জানেন না ত? ব্যাটা বুড়ো এইসব মুখরোচক গন্ধ শুনতে খুব ভালোবাসে। তা' সে যারই হোক কুলি-কামিনদের গল্পও কান পেতে ধৈর্য ধ'রে শোনে। কিন্তু যাকগে সাহেব-সুবোদের কথা, আপনি মশাই অবাক করলেন। কারখানায় কাজ করতে এসে কোনো খবরই রাখেন না,—এ আবার কী কথা? বলি, এই আমি যে কোম্পানীর কোয়াটারে থাকি না, নদীর ধারে কুঁড়ে বানিয়ে এক মুণ্ডা মেয়েছেলে নিয়ে সংসার করি,—এ কেচ্ছাটুকুও কি আপনার কানে যায় নি?

অবাক হয়ে তাকালাম মুখের দিকে। একটু ম্লান হেসে বলল,—চা খেয়ে নিন। বল্‌ছি সব। কিছুই জানেন না দেখছি!

ক্যান্‌টিনের পালা শেষ ক'রে দুজনে কারখানার ভিতরে বাসা শুরু করলাম,—ওর ভারী বুটের শব্দে মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল কন্‌ক্রীট্‌-বাঁধা চলার পথ। এরিয়েল রোপ্‌ওয়েতে ক'রে মুসাবনির খনী থেকে 'ওর্‌'-ভর্তি বাকেটগুলি সারি সারি কারখানায় আসছে, মুখ-তুলে সেইদিকে তাকিয়ে একটা লাইট্‌

পোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো দাদাবাবু, একটা বিড়ি বার ক'রে আমাকে বলল,—চল্‌বে ?

—না ।

নিজেই ধরালে বিড়িটা, বলল,—হ্যাঁ ভাই, মুণ্ডা মেয়ে নিয়ে থাকি। বেশ আছি। ও' তোমাদের বাঙালী মেয়ে আমার ধাতে সইল না! তাই ত বলি ভাই, প্রেম করো বিয়ে ক'রো না।

একটু হেসে একটু লজ্জিত ভঙ্গীতে বললাম,—আমার সম্বন্ধে কী শুনেছেন জানি না,—তবে এটুকু বলতে পারি, মারাত্মক কিছু না!

—দোষ কী ভাই!—দাদাবাবু বলতে লাগল,—চিরকালের ডানপিটে ছেলে, লেখাপড়া শিখিনি, সব কথা গুছিয়ে বলতে পারব না,—এ'কারখানার সব শালা প্রেম করে! কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে, কেউ সবার সামনে বুক ফুলিয়ে! তুমি যদি কিছু করে থাকো ত, কী দোষটা করলে দাদা ?

হেসে বললাম,—আমার কথা ছেড়ে দিন।

বিড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ খপ্‌ ক'রে ধরল আমার হাতটা, বলল,—কিন্তু খবরদার ভাই বিয়ে ক'রো না। ও'সব মেয়ে বিয়ে করলেই পস্তাবে!···প্রেম ত আমিও করেছিলাম, কী হলো তারপর ?

সাগ্রহে বললাম,—বলুন না কী হ'লো ?

একটু থেমে থেকে বলল,—ডিউটির সময় হ'য়ে গেল, ইনিয়ে

বিনিয়ে বলতে তোমাকে পারব না। তুমি বৌদি-বৌদি করছিলে না? এসো না ভাই বৌদির সংগে আলাপ ক'রে? আমি দূর থেকে খুপ্‌রীটা দেখিয়ে দেবো'খন। ক্যাম্পের বাইরে।

—বৌদি মানে আপনার স্ত্রীর কথা বলছেন?

—স্ত্রী!—দাশ বাবুর চোখদুটো যেন মুহূর্তে জ্বলে উঠ্‌ল,—একেবারে প্রেম-করে-বিয়ে-করা স্ত্রী। পড়ে পড়ে মাতাল স্বামীর হাতে মার খেতো,—আমি টেনে নিয়ে এলাম বাইরে, মুসলমান হ'য়ে বিয়ে করলাম, আবার শুদ্ধি ক'রে হিন্দু হ'লাম দুজনে, ছুটে চ'লে এলাম এখানে, এই কারখানায়। ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে তামা ঢালাই করছি আজ এগারো বছর, সে কার জন্য বলতে পারিস ভাই?

বলতে বলতে, কী আশ্চর্য, শক্ত চোয়াল, চওড়া শক্ত মুখ, কান্নার আবেগে কেঁপে উঠ্‌ল, আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, চোখের কোণ ভিজে উঠ্‌ল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে গেল। একটু হেসে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, —অথচ…অথচ…সে কী করল জানিস? দোকান খুলে বসেছে। এই কারখানার সব শালা সেই দোকানে যায়, আমি টের পাই না ভাবিস?

—মানে!

—মানে?—লোকটী অদ্ভুত হাসল, বলল,—একদিন গোটা-কয়েক টাকা হাতে নিয়ে যাস্ ওর কাছে মানেটা টের পাবি!

ব'লেই ভঙ্গীতে চাঞ্চল্য এনে দু'পা এগিয়ে গেল, একটু

থেমে মুখ ফিরিয়ে বলল,—চললাম ভাই, দেরী হ'য়ে গেলে ফোরম্যান-শালা চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে!

বুটের তলায় বাঁধানো লোহার খুরে খটাখট্ শব্দ তুলে চলে গেল দাশবাবু। আর, আমি অবাক হ'য়ে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। ওর বিষণ্ণতা আমাকেও ছুঁয়ে গেল বুঝি! ভাল লাগছে না—কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। সাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে বাড়ী চ'লে যাই। কাজের চাপও তেমন নেই আজ, সাহেব নিশ্চয়ই ছুটী দেবে।

কারখানা-অঞ্চলে 'নাগা'-করা ব'লে একটা কথা প্রচলিত আছে। কাজে না যাওয়া অর্থাৎ কারখানায় অনুপস্থিত থাকাটাকে ওখানে 'নাগা' বলে। কথাটা আমার খুব কৌতুক-কর লাগ্‌ত। বুৎপত্তিগত অর্থ কী কথাটার? জানি না। ছোটবেলায় আমাদের বাড়ীতে একটি বুড়ী ঝি ছিল, সে রাগ করাকে বলত 'নাগ'-করা। বলত,—বাবু 'নাগ' করেছে।··· আজ কারখানায় ছুটী নিয়ে অসময়ে বাড়ীর দিকে চ'লেছি, হাতে ঝোলানো খালি টিফিনক্যারীযারটাও যেন ভারী ঠেকছে, আপন মনে ভাবতে ভাবতে চ'লেছি এই সব কথা। বাবু 'নাগ' করেছে।···এই নাগ-করার সংগে কারখানার নাগা করার সম্বন্ধ আছে নাকি? আমিও ত আজ একবেলা 'নাগা' করলাম, অর্থাৎ কি না, কাজের ওপর একবেলা রাগ করলাম, ব্যাখ্যা এভাবেও করা যেতে পারে?

'রাগ ক'রেছি গো, কাজের ওপর রাগ ক'রেছি!'—কিন্তু কাকে গিয়ে বলব ওই কথা? কেন হঠাৎ ও'নীরব হ'য়ে গেল এভাবে?

দাশবাবুর কাহিনী শুনে সে বয়সে মনে-মনে শিউরে উঠেছিলাম,—জটীল জীবনের যে বিচিত্র চিত্র সেদিন কারখানায় আমার সামনে উদ্ঘাটিত হ'য়েছিল,—আমার মন তা'

মেনে নিতে পারে নি। এই জটীলতার উর্ধ্বে কি বাস করা চলে না?

ভেজানো ছিল ঘরের দরজা। ঘরে ঢুকে আমার ঘর পেরিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারটা দাওয়ায় ঠক্ করে রেখে দিরে মায়ের ঘরের দিকে গেলাম।

—কেরে, বিশু এলি?

মার প্রশ্নের প্রায় সংগে সংগেই ঢুকে পড়লাম ঘরে। বিছানায় মা শুয়ে, আর অপর্ণা শিয়রে ব'সে চিরুণী নিয়ে মায়ের চুলের জট্ ছাড়িয়ে দিচ্ছে। আমাকে এসময়ে বাড়ী আসতে দেখে তুজনেই যে বেশ চম্‌কে উঠ্‌ল এ'কথা বলাই বাহুল্য।

মা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বলে উঠ্‌ল,—হ্যাঁরে, শরীর ভালো ত?

বলে ফেললাম,—না, ভালো লাগছে না,—

তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌ল মা,—সে কীরে! বিছানা করে দিচ্ছি শুয়ে পড়্। জ্বরটর নয় ত? দাঁড়া, আসছি।

বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌ল অপর্ণা,—আমি দেখছি মাসীমা। আপনারও শরীর ভালো না,—শুয়ে থাকুন। আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি।

—সে-ই ভালো মা,—মা বলল,—আমি বুড়োমানুষ, আমি আর পারি না ও'ছেলেকে নিয়ে।

আমি বারান্দায় পোষাক বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে শুনতে পাচ্ছি, পর্ণা বলল,—ভাববেন না,—একটু জ্বর হয়ত হ'য়েছে, সব ঠিক হ'য়ে যাবে!

বাথরুমে চ'লে গেলাম আমি, নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখি, —বিছানা পেতে দিয়ে মার ঘরে ও'চলে গেছে ততক্ষণে।··· একটা চাদর গায়ের ওপর টেনে সত্যিসত্যিই শুয়ে প'ড়েছি,— ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালো শিয়রে, বলল,—জ্বর নাকি ?

উত্তর দিলাম না।

কপালে আস্তে হাতখানা রেখে তরলকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল,— একেবারে ঠাণ্ডা। জ্বর কোথায় ?

কপাল থেকে হাতখানা উঠিয়ে বুকের উপর টেনে নিয়ে এলাম,—এবার দেখ ত ?

চারিদিকে সভয়ে তাকিয়ে জোর ক'রে টেনে নিলো হাতখানা, তারপর বলল কণ্ঠস্বর নামিয়ে প্রায় ফিস্-ফিস্-করা সুরে,— আমাকে আর আই-এ পরীক্ষাটা দিতে দিলে না দেখছি !

—কেন ?

—কেন ?—কৌতুকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওর দুটি চোখ, বলল, —জানো না ?

—কী জানব ?

—ঠোঁট টিপে একটু হেসে বলল,—ধরা পড়ে গেছি।

—মানে !

—বৌদি সব ধ'রে ফেলেছে। তোমার সব চিঠি···

উত্তেজনায় উঠে বসলাম,—তারপরে ?

—বকুনী খেলাম।

—ঈস্, আমার জন্য ত ?

তেমনি হাসতে হাসতে বলল,—সবই ত তোমার জন্য।

—বৌদি কী বললেন?

—বললেন,—হ্যাঁরে পর্ণা, সত্যি? সত্যিই তুই ওকে…

থেমে গেল। বললাম,—তুমি কী বললে উত্তরে?

—কিছুই না। বৌদি আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে, দেখলাম,—ওর দু'চোখে জল!

—জল কেন?

বলল,—মেয়েদের চোখের জলের কথা তোমরা বুঝ্‌বে না।

—কিন্তু তারপর?

—ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল ওর মুখ, বলল,—তারপরে আর কিছু জানি না, যাও।

—বলো না?

বলল,—সকালে দাদা এসেছিলেন মার কাছে।

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললাম,—কী বললে!

—হ্যাঁ। শেষকালে 'লভ্‌ ম্যারেজ' আর হ'লো না।

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে, বললাম,—হেঁয়ালী ছেড়ে শীগ্‌গির খুলে বলো। ম'রে যাচ্ছি!

—আঃ! আস্তে!—বলে উঠ্‌ল,—ওঘরে মা র'য়েছেন না!

—বলো শীগ্‌গির?

তেমনি ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল কৌতুকময়ী, বলল,—তুমি যে স্রেফ্‌ বিয়ে ক'রে মার কাছে এসে বলবে, 'মা আমি বিয়ে ক'রেছি',—সেটা আর হ'লো না, এই আর কী!

—যাঃ! সেটা আবার হয় নাকি ?

মুখর হ'য়ে উঠেছে ও' আজ অদ্ভুত কৌতুকে, বলল,—'লভ্ ম্যারেজ'-এর সেটাই রীতি, জানো না বুঝি ?

—চুলোয় যাক্ লভ্ ম্যারেজ! খুলেই বলো না সব ?

—লভ্ ম্যারেজ চুলোয় যাবে ত ?—প্রগল্ভা মেয়েটী বলতে লাগ্‌ল—তাহলে যাকে বলে নিগোসিয়েটেড্ ম্যারেজ,—তাই হোক!

দুটো হাত ধ'রে বললাম,—আর দেরী সইছে না! শীগ্‌গির বলো সব খুলে!

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তিরস্কার করে উঠ্‌ল,—আবার দুষ্টুমি!

—সে কী সাধে!

বলল,—দাদা যাকে বলে 'প্রপোজ করা' তাই ক'রে গেছেন মার কাছে।

—আর মা ?

উজ্জ্বল হাসির বিভায় ভ'রে উঠল মুখখানা, পর্ণা বলল,—কী চমৎকার আমাদের মা! তখ্‌খুনি এলেন আমাদের বাড়ী। বৌদি কতো বললেন,—দিন আছে ক্ষণ আছে ত! উনি বললেন,—আমি কিছু মানি না! আমার মন যা চাইছে, তাই করব!

—কী করলেন ?

দুটি হাত প্রসারিত ক'রে বলল—কাঁকণ দুটি এখনো চোখে পড়ে নি ? এতো মায়ের হাতের কাঁকন! একেবারে আশীর্বাদ ক'রে এলেন আমাকে।

—আমার মা!

—হ্যাঁ, আমারও মা। ছাড়লেন না, আমাকে নিয়ে এলেন বাড়ী, বৌদিকে বলে এলেন,—ওকে নিয়ে গেলাম, সারাদিন আজ আমার বাড়ী থাকবে!

—আর তোমার দাদা-বৌদি?

—খুব খুশী হ'য়েছেন।

কয়েকমুহূর্ত নীরব থাকবার পর হেসে বললাম,—তারপর?

বলল,—বিয়ের পর আমাকে পরীক্ষাটা দিতে দিও, লক্ষীটি!

এ এক অভিনব স্বাদ আমার জীবনে, দুষ্টুমি ক'রে বললাম, —যদি না দেই?

—তুমি না দিলে কী হবে, মা নিজের মুখে বললেন প'ড়ে যেতে।

হেসে ফেললাম, বললাম,—হ্যাঁ গো, আর কী কী ব'ললেন মা?

বলল,—মা যে এতো ভালো, এত উদার,—আমি জানতাম না! আমাকে কী ব'ললেন জানো? ব'ললেন,—দেখ, আমার সামনে তোমরা দুজনে খবরদার লজ্জা করবে না,— আমার সামনে দু'টিতে ঘুরঘুর করবে, কথাটথা কইবে!

—মা বললেন!

—হ্যাঁ।

কয়েক মুহূর্ত আবার কাট্‌ল নীরবে। বললাম,—তারপর?

—বরপক্ষ-কন্যাপক্ষ, দু'পক্ষই ঘোরতর আধুনিক। দাদাও আসছে বিকেলে তোমাকে আশীর্বাদ করতে।

—তারপর ?

—তারপর ? আমার কথাটি ফুরালো। কিন্তু তুমি ত সব শুনেই গেলে, কিছু বললে না ত ?

—কী বলব ?

হেসে বলল,—কেন, কোনো উপদেশ ?

—না, তার দরকার হবে না।

আমার মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল পর্ণা। বললাম,—কী দেখছ ?

—দেখছি অনেক কিছু।

—কী ?

—বল্‌ব না।

—না, বলো ?

অনেক অনুনয়ের পরে বলল,—যতটা খুশি হবে ভেবে-ছিলাম, ঠিক ততটা খুশী দেখাচ্ছে না। হয়েছে নাকি আজ কিছু অফিসে ?

দাসবাবুর কথাটা মুহূর্তে মনের ওপর ছায়া ফেলে স'রে গেল বললাম,—না ত। এমনি চলে এলাম ছুটী নিয়ে।

হেসে বললাম,—কাজের ওপর আজ রাগ করেছি !

বলল,—চলো, মার কাছে গিয়ে বস্‌বে।

—চলো। কিন্তু তারপর ?

—অপেক্ষা করো আর সাতদিন।

সাতদিন পরের ঘটনা নয়, বহুদিন পরের ঘটনা। বোধহয় দেড় বৎসর, কী তারও বেশী। কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। আয় ত বাড়ানো চাই? ঘাটশিলা থেকে চ'লে এসেছি কলকাতায়। ঠিক কলকাতায় নয়, শহরতলী। কিন্তু নিছক দৈনন্দিনতার কথা বলবার জন্য এ'কাহিনীর অবতারণা করি নি, এটা বলে রাখা দরকার।

কী তিথি ছিল জানি না, সেদিন চাঁদ উঠেছিল অনেক রাত্রে। আম্র-বীথির সারি চ'লে গেছে। বোধহয় বসন্তের প্রথম মুকুলের গন্ধে বাতাস বিভ্রান্ত। ভালো করে চোখ মেলতেই চমক ভাঙ্‌ল। টেবিলে মৃদু আলোটা জ্বলছে, সামনে ব্রাউনিঙের কাব্যগ্রন্থ। আশ্চর্য, কখন যে পড়্‌তে পড়্‌তে অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলাম, তার ঠিক নেই।

উঠ্‌লাম। আলোটা নিভিয়ে এগিয়ে গেলাম খাটের কাছে। এ'পাশেই মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে আছে অপর্ণা। ডান হাতের করপল্লবের ওপর মাথা রেখে এলিয়ে আছে। বাহু প্রান্তে ভাঁজ প'ড়েছে, চুড়ি দু'খানা একটু নেমে এসেছে কব্জির কাছ থেকে। আর এদিকে আছে কেশের রাশি। বুকের কাছ থেকে কটিতট পর্যন্ত শাড়ীর কয়েকটা ভাঁজ,—আঁচলটা শিথিল হ'য়ে বিছানায় গড়িয়ে প'ড়েছে। সুন্দর মানিয়েছে

ওকে শাদা ব্লাউজের প্রান্তে-প্রান্তে আরক্তিম কী একটা আঁকা-বাঁকা লতার কাজ অস্ফুট আলোছায়ায় বেশ লাগছে দেখতে ?

সিঁথিতে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে ঘন সিঁদূর, দুই ভ্রূ-ধনুর মাঝখানে সিঁদূরের টিপ ছোঁয়ানো। চোখের পল্লব ওর বেশ ঘন, লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, মৃদু মৃদু কাঁপছে। ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসির একটা ঝিলিক।

কাছে বসলাম। কিন্তু স্পর্শ করতে ইচ্ছা করল না। বইছে ঝিরিঝিরি বাতাস, আসছে আম্র মুকুলের মৃদু গন্ধ,—একটা রাতজাগা পাখী কোথায় দূরে ডেকে চ'লেছে ব্যাকুল হ'য়ে।

কিছুক্ষণ মাত্র। হঠাৎ খুলে গেল ওর চোখ, ঠোঁট দুটি চাপা হাসির আবেগে তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠ্‌ল, অপর্ণা বলল,—কেমন মজা! আমি বুঝি ঘুমিয়েছি ?

—আশ্চর্য, তাহলে করছিলে কী ?

মুখ টিপে টিপে হাসি হচ্ছিল, বলল,—চুপ করে শুয়ে এক-জনের রকম দেখছিলাম।

—কী দেখলে ?

—রাগের বহর। রাগ করে বই পড়া! আমি ওখান থেকে সব দেখছি।

—ভারী কাজ করছ! আমি ওখান থেকে দেখছি লঘু-মেঘ-ভেসে-যাওয়া আকাশ, আমের বাগান।

—তাই বই কি!

—তার মানে ?

মুখ টিপে হাসল, বলল,—আকাশ-বাগানই যদি দেখবে, তবে, হাঁ ক'রে তাকিয়ে ছিল কে ?

—বলো, বলো, তাকিয়ে ছিলাম, আরও অনেক-কিছু করেছিলাম, বলো, বলে যাও।

—আহা, যেন আমি মিথ্যা বল্‌ছি ! আমার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনছিল কে, শুনি ?

হেসে উঠ্‌ল। চোখ পাকিয়ে বললাম,—এই খবরদার !

—চেঁচিও না, এখ্‌খুনি খোকা উঠে পড়্‌বে।

ওপাশে বালিসের বেড়াজালের মধ্যে পুতুলের মতো নরম একটা মাংসপিণ্ড নির্বিবাদে ঘুমুচ্ছিল। তার দিকে একবার দৃক্‌পাত ক'রে বললাম,—উঠুক গিয়ে।

—হ্যাঁ, তাহ'লেই চিত্তির। সারারাত ঘুমের দফা শেষ ! তোমার আর কি, এখ্‌খুনি প'ড়ে প'ড়ে ঘুমাবে, মরব আমি। যে তোমার ছেলে,—সারারাত খালি ট্যাঁ-ট্যাঁ,—ভালো লাগে না বাপু। হবে না-ই বা কেন,—যেমন বাপ্‌ তেমনি ছেলে হবে ত !

—তার মানে ? আমি কি ওর মতো সারাক্ষণ তোমার পিছনে ট্যাঁ-ট্যাঁ ক'রে বেড়াই নাকি !

—বাকীটাই বা রাখো কী ! পিছনে ঘুর্‌ঘুর ক'রে বেড়ানো, ছল ক'রে কাছে ডাকা, মাকে লুকিয়ে দুষ্টুমী করা,—এ'গুলি করে কে ?

—আচ্ছা, মনে থাকে যেন ! সারাদিন অফিসে ছট্‌ফটিয়ে

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরি, তাইতেই এত কথা! বেশ, আর শীগ্‌গীর নয়, রাত ক'রেই বাড়ী ফিরব।

—ঈস্, আবার ভয় দেখানো হচ্ছে!

—দেখো তুমি। অফিসের পর আমি রোজ সিনেমায় যেতে পারি, বন্ধুদের বাড়ী তাস খেলতে যেতে পারি। কোন্ আহাম্মক্ আর বাড়ী ফেরে!

একটা আলস্যের ঢেউ তুলে অপর্ণা উঠে বস্‌ল, ঠিক ক'রে নিলো শাড়ীটা, আর এলোমেলো চুলের রাশি মাথার পিছনে গুছিয়ে নিয়ে দুই হাত পশ্চাতে হেলিয়ে একটা আল্‌গা খোঁপা বেঁধে রাখল, তারপরে হাত দুটি আমার কাঁধের উপর দিয়ে নামিয়ে আনল বুকের কাছে, বলল,—হ্যাঁ গো, রাগ করলে?

দিলাম না উত্তর। ওর সান্নিধ্য আরো ঘন হ'য়ে এলো। একটি মুহূর্তের জন্য অনুভব করলাম আমার গালে একটা আতপ্ত স্পর্শ। অপর্ণা বলল,—তুমি ভারী ছেলেমানুষ! কী একটা ঠাট্টার কথা বলেছি, তাইতেই বুঝি মানুষ এত রাগ করে? তুমি ত জানো না, সারাটা দিন আমি কেমন করে কাটাই! কাজকর্ম, শোওয়া-বসা কিছুতেই স্বস্তি নেই।

হেসে ফেল্‌লাম, বল্‌লাম,—না, কোনো কথা নয়, এসো, আজ এই চমৎকার রাতটা আমরা শুধু জেগে এমনি পাশাপাশি গল্প ক'রে কাটিয়ে দেই।

—তাই বই কি। কোথায় সারাদিনের খাটুনির পর মানুষ একটু বিশ্রাম দিয়ে শরীরটা ঝর্‌ঝরে ক'রে নেবে, তা'না রাত জাগো, শরীর আরও খারাপ হোক! এ'রকম করতে করতে একটা শক্ত রোগ দাঁড়িয়ে যাক্ আর কী!

এরপর অনেকক্ষণ কথা বলতে পারি নি। অপর্ণা আমার গলার কাছে তার নরম আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়ে বারবার ছুঁয়ে যাচ্ছিল, একসময় ব'লে উঠ্‌ল,—ঐ যাঃ, খোকা উঠে পড়েছে। ছাড়ো, ছাড়ো,—ওকে নেই, কাঁদ্‌ছে।

খোকা সত্যিই উঠেছে, অপর্ণা তাড়াতাড়ি কোলে টেনে নিয়ে বস্‌ল। মাস ছয়েকেরও হয় নি, অথচ তার দুটি ক্ষুদ্র হাত-পায়ের বিক্রম দেখলে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়!

অপর্ণার শাড়ী বুকের কাছে দেখতে দেখতে অগোছালো হ'য়ে গেল, ক্ষুদ্র দস্যু ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল মাতৃবক্ষে অন্ধের মতো।

স্পষ্ট হ'লো জ্যোৎস্না। লুণ্ঠনরত দস্যু এবার চুপ ক'রেছে বাঁ-হাত দিয়ে অপর্ণা তাকে চেপে ধ'রেছে বুকের কাছে, ডান-হাত তার শিশুর কোমরে, নিশ্চিন্ত আরাম সে প'ড়ে আছে মায়ের কোলে। আর অপরূপ ভঙ্গীতে অপর্ণা ঘাড়টা একটু কাৎ ক'রে সুনিবিড় মমতায় চেয়ে আছে শিশুর মুখের দিকে। আকাশে জ্বলতে লাগল তারার প্রদীপ, সুগন্ধি-সুরভিত দেব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে সারি সারি দীপ যেমন জ্বলে!

মুখ ফিরিয়ে সলজ্জ হাসিতে চাইল আমার দিকে অপর্ণা, বলল,—কী দেখ্‌ছ চুরি করে, দুষ্টু?

বললাম,—সে পুরাণো কথাটা আর না-ই বা শুনলে। সে কথা যুগে যুগে বহুলোকে চিত্রে-সাহিত্যে-স্থাপত্যে বারবার বলে গেছে!

শিশুকে একটু দোলা দেবার ভঙ্গীতে নাড়াতে লাগল অপর্ণা, বলল,—সাধে কি আর কেঁদে উঠ্‌ল, খিদে পেয়েছিল বেচারীর! নয়ত, অনর্থক ও'ত কখনো কাঁদে না, এদিক দিয়ে ও' ভারী শান্ত। আর একটা কথা জানো? ও এতো লোক চেনে এ'বয়সে! মার কাছে ছাড়া আর কারুর কাছে যায় না!

অপর্ণা ঝুঁকে পড়্‌ল ওর ওপর,—মাণিক আমার—সোনা আমার!

বললাম,—চোখ যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে না? ওর বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। শুইয়ে দাও।

একটু পরেই খোকা ঘুমালো। অপর্ণা তাকে নামিয়ে রাখল তার ক্ষুদ্রকায় বালিস-পরিবেষ্টিত বিছানাটার মধ্যে। তারপর ফিরল আমার দিকে, বলল,—তুমিও শুয়ে পড়ো এবার, বরং শুয়ে শুয়েই গল্প করা যাক্‌।

—তুমি শোও, আমার ভালো লাগছেনা শুতে এখন।

অপর্ণা ততক্ষণ পাশ ফিরে শুয়েছে, অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে বলল,—বোঝা গেছে!

—কী?

—তুমি আমাকে আর তেমন ভালোবাসো না।

—বাসি পর্ণা, প্রাণ দিয়েই বাসি। বারে বারে এই পুরাণো কথাটা কেন শুনতে চাও?

অপর্ণা এবার হেসে আমার বুকে মুখ লুকালো, বলল,—খুশী। আমার কথা আমি একশোবার শুনব, তাতে কার কী এসে যায়?

আমি নিশ্চুপে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লাম। একসময় বলল,—নাও, এবার ঘুমিয়ে পড়ো, অনেক রাত হলো।

—খুব ভোরে আমায় ডেকে দিও ত?

—কেন?

—ভাবছি. কাল ভোরে গঙ্গার ধারে গিয়ে সূর্যোদয় দেখব, বহুদিন দেখি নি।

—আমাকেও নিয়ে যাবে?

—বেশ।

—তুমি ডেকে দিও কিন্তু।

—দেবো।

* * *

বহুদিন কেটে গেছে তারপর। বহু মাস—বহু বৎসর! বহু পরিবর্তনও এসেছে সংসারে। ঘুরতে ঘুরতে একবার সস্ত্রীক এলাম সমুদ্রের তীরে।

এই সমুদ্রের তীরে এসে নিজেকে যে এমন ক'রে ফিরে

পাবো, কে জান্ত! ঢেউ দিয়ে স'রে যায় সমুদ্র, ঝিনুকগুলি ঝিল্‌মিলিয়ে ওঠে। ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে নিজেকে শিশুর মতো মনে হয়। মা আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে বহুদিন, সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলতে দুলতে সেই হারাণো মায়ের কথাও মনে হয়। মনে হয়, মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। সেই শিশুবয়সে ছুটোছুটি করছি ঘরের সামনে, মা ডাকছে, বলছে, ওরে হুড়োহুড়ি করিস না ওরকম,—প'ড়ে যাবি!

আর রাত্রে সমুদ্র যখন উত্তাল হ'য়ে তার আহ্বান জানায়, তখন মন হ'য়ে ওঠে স্মৃতিমুখর। কত কথা মনে পড়ে, কত সুখ মনে পড়ে, কতো স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, কতো পার-হ'য়ে-আসা আনন্দ আর বেদনার মুহূর্তকে মনে পড়ে!

যৌবনের সেই হারাণো রাতগুলিকে যেন আবার ফিরে পেতে ইচ্ছা করে। বিহ্বল-কণ্ঠেই অপর্ণাকে বলি,—ভোরে ডেকে দিও।

—কেন?

—সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখব।

... ...

চোখ খুললাম। ভোর হ'য়ে গেছে নাকি? শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছে কে আমাকে? মেদস্ফীত দেহ, সমস্ত গালে-কপালে গভীর কুঞ্চন, চুলের অধিকাংশেই পাক ধ'রেছে,

সে এক প্রায়-বৃদ্ধা মূর্তি আমাকে ডাকতে লাগল, কণ্ঠ-স্বর রীতিমত কর্কশ,—বুড়ো বয়সে ঘুম দেখ না! ডেকে ডেকে কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভাঙানো যায়, কিন্তু একে ওঠাবে কার সাধ্য? ওঠো না, বাজারে যেতে হবেনা? এই বিদেশ-বিভূঁয়ে দেখেশুনে নিজে বাজার না আনলে চলবে কী ক'রে? ছাই আমার স্বাস্থ্য ভালো করতে আসা!……

ইচ্ছা হ'লো একবার জিজ্ঞাসা করি,—কে তুমি, তোমার নাম কী?

কিন্তু না, প্রশ্ন করব না, যদি উত্তর আসে,—আমার নাম অপর্ণা।

তাহ'লে?……

সূর্য অনেকখানি উঠে গিয়ে বেশ প্রখর হ'য়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে দেয়ালের আয়নায় নিজের ছায়া পড়তেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম,—এই কি আমি!

নিজেকে এমন ক'রে দেখি নি বহুদিন। ঘাটশিলার সেই বিজনদাছকে মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁর মহাকালের কাছে আমি আর কিছুই চাই না, আমার কানুর মাকে শুধু ফিরিয়ে দাও।

উঠে পড়ি। নাতি-নাতনীর বৃহৎ সংসার। কোলাহলে সর্বক্ষণই মুখরিত।

কী যেন খুজে বেড়াই, কাকে যেন খুঁজে বেড়াই এর মধ্যে। কে কে? অপর্ণা?

সংসারের টুকিটাকী জিনিষের সংগে ছোটদের খেলার হাঁড়ি-কুঁড়ির দিকেও চোখ পড়ে। কারখানার সেই পোড়্-খাওয়া দাশবাবুর মতোই বলতে ইচ্ছা করে,—কাকে খুঁজি ও-ওযে দোকান সাজিয়ে ব'সেছে !
